আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

আমার সংগ্রামে যিনি

মাথা না নোয়ানোর প্রেরণা

আমার মরহুম আব্বা

মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মালেক-এর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সৈয়দ আলী আহসান
জাতীয় অধ্যাপক
৬০/১ উত্তর ধানমন্ডী, ঢাকা
ফোন : বাসা ৯১১৬৬৮৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ইতিহাসকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় অষ্টম শতক থেকে। এর পূর্বের ইতিহাস আছে, কিন্তু তা সুস্পষ্ট নয়। তখন সুস্পষ্টভাবে এবং বিশেষ ধারাক্রম অনুসারে এ অঞ্চলের কর্মকাণ্ড প্রবাহিত হয়নি। সুতরাং সে সময়কার কথা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন হয় না। অষ্টম শতক থেকে পাল রাজত্বের আরম্ভ। তারা এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজ্য শাসন করতেন। তাদের আমলে সুস্পষ্ট এবং শৃঙ্খলিত কোন নগর-জীবন গড়ে ওঠেনি। এর ফলে সে সময়কার সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। নৃত্য, গীত এবং লোকরঞ্জনের বহুবিধ উপকরণ সকল মানুষের আচরণবিধি এবং জীবন যাপনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। পালরা যেহেতু বৌদ্ধ ছিল, সুতরাং তারা মানুষে মানুষে বিভাজন মানত না। তখন এমন অবস্থা ছিল যে, কর্মের দায়ভাগে এবং অধিকারে একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত, আবার ব্রাহ্মণও ইচ্ছা করলে শূদ্র হতে পারত। শূদ্র হওয়াটা তখন ঘৃণার বা অপরাধের ছিল না। বাংলা ভাষার প্রথম কবি সরহপা ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন, বড় হয়ে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এবং নালন্দা বিদ্যাপীঠের একজন আচার্যের সম্মান লাভ করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে একজন অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীকে গ্রহণ করে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার বুদ্ধিতে, বিবেকে, অনুভূতিতে এবং মননে, তার পরিচয় জাতিগত বিচারে নয়।

দ্বাদশ শতকে কর্ণাটক থেকে বহিরাগত সেনরা এসে যখন এদেশকে অধিকার করল, তখন তারা একটি নিষ্ঠুর শোষণ-কার্যের মধ্য দিয়ে এদেশবাসীকে নির্যাতন করতে লাগল। তারা সংস্কৃতিকে নিয়ে এল রাজসভার মধ্যে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে। পাল আমলে বাংলা ভাষা ক্রমশ রূপলাভ করছিল। সরহপা পুরবী অপভ্রংশে তাঁর দোঁহাকোষ রচনা করেছিলেন। সেনরা এসে সংস্কৃতকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতকে গ্রহণ করেন। তার ফলে এদেশের মানুষের নিজস্ব উচ্চারণের ভাষা সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা লক্ষ্য করি

যে, সেনদের আমলে দেশীয় ভাষার চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। সেনরা যে সংস্কৃতি নিয়ে এল, সে সংস্কৃতি ছিল হিন্দুদের এবং তাও সকল শ্রেণীর হিন্দুদের নয়, তা ছিল কৌলিন্যবাদী ব্রাহ্মণদের এবং অংশত ক্ষত্রিয়দের। সর্বশেষ সেন রাজা লক্ষণ সেনের রাজদরবারে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানকে কাব্যে রূপান্তরিত করে একটি বিশেষ কাব্যধারার জন্ম দিলেন। এর ফলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে বর্ণহিন্দুদের অধিকারে চলে গেল।

১২০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর আগমনে এদেশের সাধারণ মানুষ নতুন করে চেতনা পেল। সুকুমার সেন তাঁর একটি রচনায় স্বীকার করেছেন যে, অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা বখতিয়ারের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল, এমনকি কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণও বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনকে বিভ্রান্ত করে দেশত্যাগ করতে সহায়তা করেছিল। মানুষে মানুষে বিভাজন মুসলমান আমলে আর রইল না, পাল আমলেও এটা ছিল না। মুসলমানরা একটি নতুন বিশ্বাসকে আনলেন, এদেশের সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং একটি বিস্ময়কর মানবিক চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটালেন।

আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ এবং বিকাশকে আলোচনা করতে গেলে পাল আমলের বিস্তৃত পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সেনরা যে অসৌজন্যের জন্ম দিয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট পরিচিতি উপস্থিত করা প্রয়োজন। অবশেষে মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে নতুন মানবিক রূপ পরিগ্রহ করল তারও বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। এ নিয়ে অল্পস্বল্প লিখিত হলেও বিস্তৃতভাবে এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি। সম্প্রতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তাঁর 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থটি যার নাম 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে নতুন করে উদ্‌ঘাটন করেছে। আমরা বিশেষ একটি ভূখণ্ডের অধিবাসী এবং সেই ভূখণ্ডের অতীত এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে যে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে এবং তা পাল আমল থেকে ক্রমশ গড়ে উঠেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকের কারণে বহিরাগত সেনদের সংস্কৃতিকে বিরাট এবং মহার্ঘ করে দেখানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের আত্মবোধবিমুখ কিছু সংখ্যক লোক হিন্দুদের বিবেচনাটি মেনে নিয়েছে। এহেন অবস্থা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে এ পথে এগিয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ দেই।

তার এই গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৪.০২.১৯৯৪

ভূমিকা

রাষ্ট্র কখনো সাগরের বুকে একটি দ্বীপের মতো হঠাৎ জেগে ওঠে না। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখারও একটি পুরাতত্ত্ব থাকে, তার একটি অতীত থাকে। বর্তমান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হলো পূর্বপুরুষদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। সেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত হয় বর্তমান স্বাধীনতার শিকড়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষদের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এই সংগ্রামের রয়েছে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা ও অসামান্য বহমানতা। সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব-পতাকা হাতে এই ভাটি অঞ্চলের সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই করেছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এই জনপদ বিবেচিত হয়েছে উপমহাদেশের বিশাল মানচিত্রে আর্যপূর্ব সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলরূপে। এ এলাকার জনগণের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিকট-অতীতে এ লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটর বর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্যরা তাদের অধিকার বিস্তৃত করে নানা ঘোরপথে যখন এ বদ্বীপে উপনীত হলো, তখন থেকে একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশের জনগণের আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াই পর্যন্ত এ জাতির সংগ্রাম ও সংক্ষোভের মূলধারা রচিত হয়েছে অভিন্ন প্রেরণার এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

এ অঞ্চলের মানুষের বংশধারায় বহু-বিচিত্র রক্ত প্রবাহের মিশেল ঘটেছে। সেমিটিক দ্রাবিড় রক্তের সাথে এসে মিশেছে অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলীয়, এমনকি আর্য-রক্তের ধারা। এ প্রবাহ এমনভাবে মিশে গেছে যে, নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় কাউকে এখন আর স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। চেহারার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এলাকার গরিষ্ঠ মানুষের মিল রয়েছে তাদের জীবনদৃষ্টিতে। জীবনদৃষ্টির অভিন্নতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তাদের জীবনের অভিন্ন লক্ষ্য এবং একত্রে বসবাসের ও জীবনধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বাসনা ও প্রতিজ্ঞা। অভিন্ন বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জন্ম হয়েছে তাদের একটি জীবনচেতনা ও আচরণরীতি। তাদের আকাঙ্ক্ষায় ও তাদের সংগ্রামে এই জীবনচেতনারই স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের সংগ্রামের লক্ষ্যকে এই জীবনচেতনাই নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নির্মাণ করেছে তাদের ইতিহাস। এভাবে এ এলাকার মানুষের বোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত নিরন্তর সংগ্রামের ধারাকে অবলম্বন করেই তাদের একটি পরিচয় নির্মিত হয়েছে। এ পরিচয়ই তাদের জাতিসত্তার ভিত্তি।

বাংলাদেশের জনগণের আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মানবিক আদর্শকে অবলম্বন করে। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণে অসমর্থ হলো। বৌদ্ধ সংস্কৃতির পতনের সাথে সাথে সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, সামাজিক নিপীড়ন, বিচারবুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক অনাচারে ডুবে গেল। এ সময় ইসলাম তাদের জীবনে নতুন প্রেরণা ও আশাবাদ সঞ্চার করলো। এ এলাকার বিপন্ন নর-নারী ইসলামের মধ্যে খুঁজে পেল তাদের আত্মরক্ষার বিশ্বস্ত অবলম্বন। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণা, উদার অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন মানবিক আবেদন, ইসলামের প্রচারশীলতা ও ইহলৌকিকতা, এর সাংগঠনিক বুনিয়াদ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং এর সাম্যভিত্তিক বিধিবদ্ধ সামাজিক সংবিধান এই এলাকার মানুষকে সুদৃঢ় কাঠামোর ওপর মেরুদণ্ডবান জনগোষ্ঠীরূপে দাঁড় করিয়ে দিল। ইসলাম এলো একটি পূর্ণ বিকশিত সংস্কৃতি নিয়ে এবং সেই সংস্কৃতি তাদেরকে আর্য-আগ্রাসনের মুখগহ্বর থেকে বের করে এনে তাদের নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় জীবনক্ষেত্রকে জাগ্রত, সচেতন ও সক্রিয় করে তুলল। ফলে এ এলাকার মানুষেরা আর্য-আগ্রাসনকে সাফল্যের সাথে প্রতিহত করল এবং ইসলাম বৌদ্ধ সংস্কৃতির মতো বিলুপ্ত হয়ে গেল না, জনগণের অস্তিত্বের গভীরে ঠাঁই করে নিয়ে টিকে থাকল।

কে এম পানিক্কর দেখিয়েছেন যে, ইসলামের আগে আর্য-আগ্রাসনের মোকাবিলায় যে দুটো সংস্কৃতি জনগণের সংগ্রামকে শক্তি যুগিয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে সেগুলো কতটা আনুভূতিক ব্যাপার। ফলে আর্য-সংস্কৃতির সাথে নিজেদের পার্থক্যটাকে জৈন ও বৌদ্ধরা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। এই দুটো সংস্কৃতি ক্রমশ আর্য-সংস্কৃতির গ্রাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম আর্য-সংস্কৃতির মোকাবিলায় শুধু আত্মরক্ষা করতেই সমর্থ হলো না, ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক দু'ভাগে বিভক্ত করে স্পষ্ট দু'টি জাতিত্ব সৃষ্টি করল। (এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি)

ইসলাম এদেশের সামাজিক অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিল এবং নৃতত্ত্বের তথাকথিত প্রাচীরও অপসৃত করল। ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী বংশ ও বর্ণচেতনার অবসান ঘটলো। গোড়াপত্তন হলো জীবনদৃষ্টি, বিশ্বাস ও আদর্শের ঐক্যের ভিত্তিতে এক নতুন জনগোষ্ঠীর। জেগে উঠলো এক নতুন জাতিসত্তা। ইসলাম এসে এখানে সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করেছে এবং বংশ ও রক্তভিত্তিক গোষ্ঠী-ধারণাকে সমূলে উচ্ছেদ করে বিশ্বাসের ঐক্যকে সামাজিক ঐক্যে রূপান্তরিত করেছে। এই প্রক্রিয়ায়ই বর্ণাশ্রমের এই দেশ– আদিবাসী ও বৌদ্ধদের এই দেশ– মাত্র কয়েকশ' বছরে একটি নতুন জাতির দেশরূপে গড়ে উঠলো। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ভিত্তিমূলে রয়েছে এদেশে ইসলামের অভ্যুদয়কালে যারা বাস করতেন, তাদের সাথে বিদেশাগত মুসলমানদের রক্তের অবাধ মিশ্রণ। স্থানীয় অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মুসলমানদের সংখ্যা এদেশে দ্রুত বেড়ে গেল এবং এদেশের জন-কাঠামোর রূপ বদল ঘটলো পুরোপুরি। ফলে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় উজ্জীবিত একটি নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটলো এখানে। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারাও তাদের অনড় বর্ণাশ্রম ও জাতিবৈষম্য নিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি বাস করতে থাকলো পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে। ইসলাম তাদের গ্রাস করল না, তাদের জন্যও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করল।

মুসলিম শাসনের শুরু থেকে শত শত বছর বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও আলাদা জীবনাচরণের মাধ্যমে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করেছেন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে এই স্বাতন্ত্র্যচেতনা বড় ধরনের কোন সংঘাত সৃষ্টি করেনি। বাংলায় সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের মাঝখানে মাত্র একবার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের অমাত্য, ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশ, পনেরো শতকের গোড়ার দিকে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন চার বছরের জন্য। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, গণেশের এই স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব ছিল 'হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা'। এই ঘটনার একশ' বছর পর ষোল শতকের শুরুতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য মুসলিম সালতানাত ধ্বংসের চেষ্টা করেন। সে সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য হলো ঃ 'তিন শত বছরের মধ্যে বাঙালি ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই।... চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্য যুগ)

ব্রিটিশ শাসনকে ঘিরেই হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এ আমলের ঘটনাপ্রবাহকে নিম্ন ক্রমানুসারে সাজানো যেতে পারে ঃ

এক. ইংরেজরা ১৬৩৪ সালে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভের পর কলকাতা ও কাসিম বাজারে যেসব দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করে, তারা সবাই ছিল হিন্দু। এই বাণিজ্যিক যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে একটি ষড়যন্ত্রমূলক ইঙ্গ-হিন্দু মৈত্রী গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বর্ণহিন্দু মিত্রদের সহযোগিতা নিয়েই ইংরেজরা এদেশের রাজনীতির দিকে হাত বাড়াতে থাকে।

দুই. ব্রিটিশ শাসন হিন্দুদের কাছে ছিল নিছক শাসক বদলের ঘটনা। ইংরেজদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা ইংরেজ শাসনে তাদের জাতিসত্তা বিপন্ন দেখতে পায়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরামহীন, আপসহীন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়ে 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা' রূপে চিহ্নিত হয়।

তিন. হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোন সহানুভূতি ছিল না।

চার. ইংরেজদের জুনিয়র পার্টনাররূপে একের পর এক শোষণ-সাফল্যের মধ্য দিয়ে বর্ণহিন্দুরা এগিয়ে যায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তা ছিল মুসলমানদের প্রতি আক্রমণাত্মক। অন্যদিকে মুসলিম আমলের রাজধানী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অন্ধকারে তলিয়ে যায়। মুসলমানদের ভাগ্য মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

পাঁচ. কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজরা প্রশাসনিক কারণে বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ভাগ করে। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠন করলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুরা এই প্রশাসনিক বিভাজনকে 'বঙ্গভঙ্গ' আখ্যায়িত করে একে 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা সর্বত্র সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে বিবেচনা করেছিল তাদের 'ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত'রূপে।

ছয়. হিন্দুদের তুষ্ট করার জন্য ইংরেজরা 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়, অন্যপক্ষে হিন্দুরা খুশি হয়। তারা করজোড়ে ইংরেজদের বন্দনা গায় 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা' রূপে।

সাত. মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন এবং তারা এটাকে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গভঙ্গ' নামে অভিহিত করেন।

আট. বঙ্গভঙ্গের ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের জাতি-স্বাতন্ত্র্যচেতনার ভিত্তিতে তাদের স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক মঞ্চরূপে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মুসলিম লীগ ৪০ কোটি মানুষের অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু ৯ কোটি মুসলমানের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি বা রক্ষাকবচ দাবি করে। তাদের দাবি কংগ্রেস শিবিরের পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ফলে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক মুসলিম আবাসভূমির দাবিতে সংগ্রামে লিপ্ত হয় মুসলিম লীগ। সে আন্দোলনে বাংলার মুসলমানগণ সংগ্রামে, সাহসে ও ত্যাগে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

নয়. উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বেঙ্গল প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে হিন্দু মহাসভা ও

কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নতুন করে বঙ্গভঙ্গের দাবি ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার জন্য চেষ্টা চালায় মুসলমানরা। অখণ্ড বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ বানানো যাবে না— বিবেচনা করে বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র স্বাধীন অখণ্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। মুসলিম লীগ হাই কমান্ড তাতে সম্মত হলেও গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেলের কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অনমনীয় রায় দেয়।

দশ. সবশেষে ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, এ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। তাদের ধারণা ছিল, পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে তার ফলে দুই জাতিতত্ত্বের মৃত্যু হবে। এটি তারা শুধু মনেই করেননি, প্রচারও করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাঙালি হিন্দুরা এ আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন, কিন্তু একাত্ম হলেন না বাঙালি মুসলমানদের সাথে।

বস্তুত, ব্রিটিশ শাসনের আগে-পরের সমস্ত ঘটনাই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিজাত পার্থক্যের ভেতর দিয়ে বাঙালি জীবনের দুটি বিপরীত স্রোতধারাকে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিলোপ হলে এ আন্দোলনে শরীক হয়ে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গড়ার সংগ্রামে ওপারের বাঙালিদের যোগদানে বাধা ছিল কিসের?

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাঙালিরা নিজেদেরকে বাঙালি মানেন এবং এপার আর ওপার নিয়ে বাঙালি এক অবিভাজ্য অখণ্ড সত্তা বলে তারা প্রচারও করেন। কিন্তু সেখানেও তারা স্বাধীন বাংলাদেশী জাতিসত্তায় আস্থাবান নন। তাদের আস্থা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ওপার বাংলার শ্রেষ্ঠ বাঙালিরা অনেক আগেই নিজেদের জাতীয়তা ভারতের 'মহামানবের সাগরতীরে' নির্ধারিত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই সর্ব ভারতীয় জাতীয়তার রসে সিক্ত, যার মূল প্রস্রবণ তাঁর নিজের ভাষায়ই হলো উপনিষদ। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে দিল্লীর অধীনে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে তারা আস্থাশীল; কিন্তু অখণ্ড বাংলাদেশ কিংবা অখণ্ড বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে তারা বিশ্বাস করেন না।

এখানে একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকবোধ কাজ করে এবং তা বিভিন্ন সময় স্থূলভাবেই প্রকাশও পেয়েছে। তা হলো, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাংলাভাষীরা পূর্ববাংলার সাথে মিলিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাথে মিলিত হলে সেখানে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগুরু। (ড. অতুলসুর তাঁর 'দুই বাংলা কি এক হবে' নামক বইয়ে এই বিপদের কথা কিছু দিন আগেও প্রকাশ করেছেন।) সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সময়ও তাদের অনেকে এ হিসাবটা করেছিলেন। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়ালো? ওপারের বাঙালিরা দিল্লীর

অধীনতা ত্যাগ করে এসে এপারের সাথে মিলিত হতে রাজি নন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে। আর এপারের বাংলাদেশের বাঙালিরাও পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলিত হয়ে দিল্লীর জোয়ালের নিচে নিজেদেরকে জুড়ে দিতে রাজি নন হিন্দু অধীনতার ভয়ে। ওপার আর এপারের বাংলাভাষী লোকদের নিয়ে এক দেশ এ জন্যই কখনো হলো না।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় জাতি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল, সেটাকে রক্ষা করাই বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করে। এটাকেই তারা নিজেদের ভৌগোলিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলেও গণ্য করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নিজেদের এক ইঞ্চি জায়গাও একে অপরকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ভারতের বন্ধুত্বের আশায় মুজিব সরকার বেরুবাড়ি হস্তান্তর করেছিলেন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। কিন্তু তার বিনিময়ে তিন বিঘা করিডোরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আজো সংগ্রাম করছে বাংলাদেশের মানুষ। ব্রিটিশ ভারতের প্রাচীন রাজধানী এবং ভারতীয় বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল কলকাতার বন্দরকে নাব্য করার উছিলায় ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে আন্তর্জাতিক নদীর পানি থেকে বঞ্চিত করা হলো এপারের বাঙালিদের। তার বিরুদ্ধে ওপারের ভারতীয় বাঙালিরা প্রতিবাদ করলেন না। বরং এত বড় অন্যায়কে সমর্থন করলেন। গঙ্গার পানির অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে বৈঠক করতে বাংলাদেশের নেতা হিসেবে ভারতে গেলেন আমাদের নৌবাহিনী প্রধান। কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলো তাঁকে 'ডিঙ্গি নৌকার মাঝি' বলে কটাক্ষ করল। এভাবে তারা দিল্লীর অধীনে নিজেদের বড়ত্ব জাহির করল এবং আমাদের স্বাধীন সত্তার প্রতি তাচ্ছিল্যও দেখাল।

এর পেছনে কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে? ফারাক্কার পানি, কাঁটাতারের বেড়া, আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম, দক্ষিণ তালপট্টি, এগুলোর কোনটাই বাংলাদেশের জন্য ছোট ইস্যু নয়। এসব ইস্যুতে ওপার বাংলার আর এপার বাংলার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। দুয়ের মনোভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এপার আর ওপারের এই পার্থক্যটি চিরন্তন। "এ প্রভেদ মনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, কর্মের, নামের, নিশানের, ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, খোরাকের, পোশাকের, আদবের, লেহাযের, কায়দা-কানুনের, জীবনবোধের, জীবনধারণের, জীবন দর্শনের ও জীবন সাধনার।" ভাষা এক হলেই যে জাতিসত্তা সব সময় এক হয় না, তার প্রমাণ একই ভাষাভাষী বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের জনগণের জীবনদৃষ্টিজাত মনস্তত্ত্ব।

হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে লালিত একটি সুচিহ্নিত জীবনদৃষ্টিই বিকশিত করেছে এ এলাকার মানুষের জাতিসত্তাকে। এই সত্তাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রসত্তা। নিজস্ব পরিচয়, ভাব ও গৌরব নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ একটি শক্ত মেরুদণ্ডবান জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলরূপে। আমাদের জাতিসত্তার এই ভিত যতদিন অটুট থাকবে, আমরা আমাদের স্বাধীন মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব ততদিন অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব। এই ভিত্তি নষ্ট হলে এদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হারিয়ে যাবে। একটি স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তিতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হচ্ছে বলেই বাংলার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ মাথা উঁচিয়ে, তর্জনী নাচিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন, 'ঢাকা এখন শুধু বাংলাদেশের রাজধানী নয়, বাংলাভাষারও রাজধানী।' এই স্বাধীন অস্তিত্বের অহঙ্কারেই বরেণ্য ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমদ নিজের বুকে আঙ্গুল ঠুঁকে আপন জাতিসত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে পারেন, 'বাংলা সাহিত্যে এখন আমরাই ডমিনেট করবো।'

ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন জাতির রাজধানীর মেজাজ নিয়ে শত শত বছর ধরে বেড়ে ওঠা ঢাকা শহর শত বছরের পরাধীনতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে মর্যাদা নিয়ে আবার মাথা তুলেছে এই 'আমরা'র স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে অবলম্বন করে। অন্যদিকে 'নাবিক বণিক লোফার' ইংরেজ আর তাদের দালাল, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দীদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে এবং ঔপনিবেশিক রাজধানীরূপে বেড়ে ওঠা কলকাতা এখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে একটি নির্জিত শহররূপে দিল্লীর অধীনে দ্রুত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে কোন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের কণ্ঠে এমন প্রত্যয়ী উচ্চারণ আর শোনা যায় না। সেখান থেকে ভেসে আসে ডুবন্তপ্রায় বাঙালিদের এক ধরনের আর্ত-চিৎকার।

এই বইয়ে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রামের ধারাবাহিকতার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরে আমাদের জাতিসত্তা বিকাশের ধারাক্রমকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। এই জাতিসত্তার সুরক্ষা ও বিকাশ দানের মধ্যেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের ও অহঙ্কারের বীজ নিহিত। এ জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ সংগ্রাম করেছেন, এ জন্য আমরা লড়াই করছি এবং আমাদের এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। কেননা, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চাইতে মহত্তর আর কিছু নেই। এই সংগ্রাম কারো বিরুদ্ধে নয়। এই সংগ্রাম আত্মরক্ষার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের।

আমাদের জাতিসত্তা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম ১৯৭৭-৭৮ সালে মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ফযলে আযীমের তাকীদ ও অনুপ্রেরণায়। এর পর ১৯৯২-৯৩ সালে কয়েকটি জাতীয় সেমিনারের জন্য প্রায়-অভিন্ন বিষয়ে আমাকে কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়। সমাজ অধ্যয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে 'আমাদের জাতিত্তার বিকাশধারা' নামে এবং বাংলা চৌদ্দ শতক জাতীয় উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত 'বঙ্গভঙ্গ ও রাষ্ট্রসত্তা' শীর্ষক সেমিনার দু'টি এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সেমিনারে পঠিত আমার প্রবন্ধগুলো দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের বিবেচনা লাভে সমর্থ হয়। তাঁদের পরামর্শ আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত

ও উৎসাহিত করে। এই বই বিভিন্ন সময়ে লেখা আমার সেসব প্রবন্ধের সংকলন নয়, তবে সেগুলোর ওপর বহুলাংশে ভিত্তিশীল।

বইটির ব্যাপারে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক আবুদল গফুর, জনাব মাশীর হোসেন, জনাব শামসুল হক, জনাব আবদুল মান্নান তালিব, জনাব মোহাম্মদ সাখী মিয়া, জনাব মাহবুবুল হক, জনাব আবুল হাসান মাহমুদ ও সহকর্মী জনাব নজরুল ইসলাম খানের কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। স্নেহভাজন রাফে সামনানের অব্যাহত তাকীদ না থাকলে আমার পক্ষে এ বইয়ের কাজ এ সময় হাতে নেওয়াই হয়ে উঠতো না। বইটির লেখা থেকে এর প্রুফ দেখা পর্যন্ত সমস্ত কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী মাকসুদা বেগম। আশা প্রকাশনের জনাব আবদুল আউয়াল জাতির প্রতি একটি অঙ্গীকার পোষণ করেন এবং সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি আন্তরিক আগ্রহের সাথে এ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। আশা কম্পিউটারের কর্মীগণ বইটির দ্রুত প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বন্ধুবর হামিদুল ইসলামের প্রচ্ছদ বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের কাছে। তিনি আমার সামান্য কাজকে সমাদর করেছেন এবং মুখবন্ধ লিখে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মূল্যবান মতামত ও মন্তব্য আমার জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে।

সকলের এ সার্বিক প্রচেষ্টাকে পিপাসু পাঠক যদি সমাদর করেন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে তৃপ্তিবোধ করবো।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ খ্রি. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
৩৭ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের আরয

আমাদের জাতিসত্তা বিকশিত হয়েছে ইতিহাসের নানা বাঁক পরিবর্তন, মোড় অতিক্রমণ এবং বহু বিচিত্র ক্রান্তিকালীন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। এ বইয়ে আমি ইতিহাসের সেই আঁকা-বাঁকা গতিপথের একটি রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং চিন্তাশীল পাঠক আমার এই সামান্য কাজকে অসামান্য বিবেচনায় প্রশংসা করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে বইটি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু পাঠকের কাছ থেকেও এ বই সম্পর্কে সাড়া পেয়েছি। ১৯৯৪ সালে এ বই প্রথম প্রকাশের অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বইটির পাঠকচাহিদা থেকেও আমি আশ্বস্তবোধ করেছি যে, এ বই লেখার প্রয়োজন ছিল। আমার পরিশ্রম আশাতীত সফল হয়েছে ভেবে আমি উৎসাহিত হয়েছি।

পেশাগত দায়িত্ব পালনে কয়েক বছর দেশের বাইরে থাকার কারণে সময়মতো দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিতে পারিনি। কিছু পরিমার্জন ও নতুন কিছু তথ্য সংযোজনের তাকীদ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ বিলম্বিত করেছে। খুশির কথা যে, জনাব মোহাম্মদ শরীফ হোসেনের আগ্রহ ও উদ্যোগে দারুস সালাম পাবলিকেশন্স থেকে এখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান সংস্করণে বইটির মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে ভাষা ও বিন্যাসের কিছুটা পরিমার্জন করেছি। বেশ কিছু নতুন তথ্য এতে সংযোজন করেছি। বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত 'পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব'রূপে কলকাতায় 'শারদীয় দুর্গোৎসব' চালু হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে তথ্যশূন্য কিছু অহেতুক বাদানুবাদ হয়। এ গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে একজন মন্ত্রী বক্তৃতা করেন। সে বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের একটি আদালতে মামলা হয়। পরে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমান সংস্করণে সে প্রসঙ্গে শ্রীরাধারমণ রায়ের 'কলকাতা বিচিত্রা' গ্রন্থের 'কলকাতায় দুর্গোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি সংযোজিত হলো। দ্বাদশ অধ্যায়ের 'ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলায় জাগরণের ধারা' উপ-শিরোনামীয় অংশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'গরমিলের রাজনীতির পয়লা দশক', 'গরমিলের রাজনীতি : দ্বিতীয় দশক' এবং 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' উপ-শিরোনামের অধীনেও কিছু নতুন সংযোজনী রয়েছে। এসব সংযোজনীর কারণে এবং অক্ষর বিন্যাস ও উপস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন আনার ফলে বইটির আয়তন পূর্বের নয় ফর্মা থেকে এখন প্রায় পনেরো ফর্মায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সংস্করণ আগের চাইতে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করার কাজে যাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন এবং নানাভাবে এ সংস্করণের কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন, তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

১৯ জুলাই ১৯৯৮ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

তৃতীয় সংস্করণে লেখকের আরয

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের এ মুহূর্তে আমি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থটি দেশে-বিদেশে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে আশাতীত সমাদৃত হয়েছে দেখে আমি উৎসাহ বোধ করছি। আমি আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থটি রেফারেন্স তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থের ওপর ইতোমধ্যে ঢাকা ও কলকাতার বহু পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। অনেক বিদগ্ধজন তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত ও উৎসাহিত করেছেন। তার মধ্যে জনাব শাহ আবদুল হান্নান ও জনাব এম. আযীযুল হকের নাম এ মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জনাব এম. আযীযুল হক তাঁর ঢাকার বাসা থেকে একদিন রিয়াদে আমার কর্মস্থলে ফোন করে এ গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন জানান। তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম : " আমি এইমাত্র আপনার বইটি পড়ে শেষ করলাম। কোনো ব্যাংকের এমডি হয়ে মারা যাওয়ার চেয়ে এ ধরনের একটি বই রেখে মৃত্যুবরণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" আমি তাঁর কথা দ্বারা সেদিন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

এ ধরনের উৎসাহের মধ্যেই আমি আমার পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের গরীয়ান জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের দু-একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কাজ করছি। আমি এ কারণেও উৎসাহিত ও আনন্দিত যে, আমাদের দেশের গল্পপ্রিয় অনেক মানুষ এখন আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় ইতিহাসের প্রধান বাঁকগুলো সম্পর্কে জানার জন্য ক্রমেই অধিকতর আগ্রহী ও উৎসুক হয়ে উঠেছেন। এ ব্যাপারে বইপত্রের ঘাটতি পূরণে শিকড়সন্ধানী একদল লেখক-গবেষকও এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ সকল দিক থেকেই সামনে এগোচ্ছে– এটি একটি বড় সুলক্ষণ বলে আমি মনে করি।

'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে 'কামিয়াব প্রকাশন' আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এজন্য এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এবং বিশেষভাবে অনুজপ্রতিম মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশিষ্ট গবেষক কবি সাংবাদিক বন্ধুবর আবদুল মুকীত চৌধুরী এ গ্রন্থটি মুদ্রণের আগে আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১৮ মার্চ, ২০০৬ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিষয় বিন্যাস

১.

সভ্যতার পতাকা হাতে সাহসী মানুষ

আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রীক বিবরণীতে গঙ্গার পুবদিকে গঙ্গারিড়ী বা বঙ্গ-দ্রাবিড়ী নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা-বিধৌত এ রাজ্যের বঙ্গ-দ্রাবিড় জাতি ছিল অপরাজেয় শক্তি। টলেমী জানাচ্ছেন, গঙ্গা-মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিড়ীরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গা খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল-রত্ন পশ্চিম দেশে রপ্তানি হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত জাতি ভারতে আর নেই।

আদিতে বঙ্গ ছিল বর্তমান বাংলাদেশেরই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বঙ্গ সেই স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতর রূপেই পরিচিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকেও বাংলার শুধু পুর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলই বঙ্গ নামে অভিহিত হতো। পাল ও সেন আমলে এবং মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত ছিল রাঢ় নামে। উত্তর বঙ্গকে বলা হতো পুন্ড্রবর্ধন, বরিন্দ কিংবা লাখনৌতি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। বাংলার পুব ও দক্ষিণ অঞ্চলকে মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর ১২৪২-৪৪ সালের তাবাকাত-ই-নাসিরীতে বঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকা গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে জিয়াউদ্দীন বারনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-ই-ফীরূজশাহীতে প্রথম তা উল্লেখ করেন। মিনহাজের 'বঙ্গ' আর বারনীর 'বাঙ্গালাহ' বাংলার পুব-দক্ষিণবর্তী অভিন্ন অঞ্চল। বৃহত্তর ঢাকা ও সাবেক ত্রিপুরা জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চল সমতট নামেও পরিচিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা দূর-অতীতে কখনো বাংলা বা বাঙ্গালা কিংবা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না।

বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ ঈসায়ী) প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকার ব্যাপকতর এলাকাকে বাঙ্গালাহ্ নামে অভিহিত করেন। লাখনৌতি (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ও বাঙ্গালাহকে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল তার আমলেই প্রথম বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয় এবং তিনি প্রথমবারের মতো শাহ-ই-

বাঙ্গালাহ নাম ধারণ করে নিজেকে বৃহৎ বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এর ফলে এখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের সূচনা হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের– সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান (মুসলিম) আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।"
> (বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব– সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ২২)

এরপর বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার আয়তন পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু বৃটিশ ভারতের বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশ নয়, পশ্চিমে বিহারের অংশ, পুবে আসাম এবং কোন কোন সময় উড়িষ্যার অংশবিশেষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এসবের শাখানদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটির পাললিক গঠন ও মৌসুমী আবহাওয়া বাংলাদেশের মাটিকে বিস্ময়করভাবে উর্বর করেছে, চাষাবাদকে করেছে উৎসাহিত। সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের আকর্ষণ আর ভূ-প্রকৃতিগত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে ঘন বসতিপূর্ণ। নদ-নদীর তীর ঘেঁষে এখানে গড়ে উঠেছে মানব-বসতি, পত্তন হয়েছে গ্রাম-বন্দর। এ জনপদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার-বন্দর বিকশিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহকে ঘিরে। নদ-নদীর দুই পার জুড়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে বিরামহীন ভাঙ্গা-গড়া আর পরিবর্তনের ধারা। এদেশের অনেক জনাকীর্ণ শহর-গ্রাম-জনপদের উত্থান আর পতনের সাথে এ ধারা মিশে আছে। বাংলার জন-জীবনে এবং এদেশের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ন্ত্রণেও যুগ-যুগ ধরে নদ-নদীর রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা।

নদ-নদীর প্রবাহ এ দেশের সমতলভূমিকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাজিত করেছে। এসব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা ও ঐক্যবদ্ধ রাখা বরাবরই ছিল কঠিন কাজ। এসব বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত এলাকায় স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক সত্তার উত্থান ও বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ এলাকার রাজনীতি চিহ্নিত হয়েছে বহুকাল। রাজ্য ও প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহের দ্বারা। বহিঃসীমান্তের নদীপ্রবাহ এবং অভ্যন্তর ভাগের অসংখ্য শাখা, প্রবাহ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা ও জলপ্লাবিত সমতলভূমি এদেশকে দুর্গম করেছে। বাইরের হামলার বিরুদ্ধে দিয়েছে প্রতিরক্ষার প্রাকৃতিক সুবিধা। এ বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আদি-বঙ্গ বরাবরই বাইরের হামলা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চল ও উত্তর বঙ্গ প্রাচীনকালে বহুবার উত্তর ভারতীয় শাসকদের কর্তৃত্বাধীন হয়েছে।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এ দেশের মানুষের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এ এলাকার মানুষকে কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী করেছে। সংগ্রামশীল এই সাহসী মানুষেরা বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার দুর্জয়

প্রেরণা নিয়ে। হাজার বছরের কুসংস্কার আর অধর্মের বিকৃতি বুকে নিয়ে বৈদিক শাস্ত্র-শাসনের ভারে ন্যূজ ও আড়ষ্ট ভারত তার ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে যে কোন পরিবর্তনের ধারাকে ভয় পায়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রাণ-ধর্ম ও হৃদয়-আবেগের দু'ধার স্রোতস্বিনীর মুখে সেসব জঞ্জাল ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অনায়াসে।

সেমিটিক তৌহিদবাদী ধর্মমতের উত্তর-পুরুষ এবং উন্নততর সংস্কৃতির ধারক বঙ্গ-দ্রাবিড়রা আর্যদের শির্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের তপস্যা ও যাগযজ্ঞ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে কখনো কবুল করেনি, মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট, নযিরবিহীন জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়েও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ বিশ্বাস, শিক্ষা, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষের চিত্ত জুড়ে গভীর আসন গেড়েছে। জীবাত্মার নির্বাণ লাভের বুদ্ধ-বাণী তাদেরকে উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সবশেষে মানব-মুক্তির মহাসনদ ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে এ জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় ও তার সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য-ভারতে ও রাজস্থানের নানা জায়গায় প্রাক-আর্য তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় এমনি সভ্যতা-সম্পন্ন এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। তারা প্রধানত দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা ছিল। এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তারা এসেছে সেমিটিকদের আদি বাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়া দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল। এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। তারাই ইয়েমেন ও ব্যাবিলনকে সভ্যতার আদি বিকাশভূমিরূপে নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালা উদ্ভাবন দ্রাবিড় জাতিরই অবদান। সুপ্রাচীন এক গর্বিত সভ্যতার পতাকাবাহী এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ভাতরবর্ষে আর্য আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। অনুরূপ সভ্যতার পত্তন হয়তো তারা বাংলাদেশেও করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে সেগুলোর চিহ্ন এখন নেই। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

> 'তারা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতো সুন্দর নগরী পাক-বাংলায় নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোন চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলা যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতি, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দায করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না।' (আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি, পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা-১৯৬৯)।

২.

বাংলায় আর্য আগমন

দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত আর্যদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই যাযাবরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে বাড়াতে আরো পুবদিকে অগ্রসর হয়। সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বৈদিক আর্যরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় অর্জনেও সকল শক্তি নিয়োগ করে। প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর ভারত আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বাধীন মনোভাব ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত বঙ্গবাসীরা আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ায়। ফলে করতোয়ার তীর পর্যন্ত এসে আর্যদের সামরিক অভিযান থমকে দাঁড়ায়।

আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেন :

> "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে ভাগলপুরের সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ২১)

সামরিক অভিযান ব্যাহত হওয়ার পর আর্যরা অগ্রসর হয় ঘোর পথে। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান পরিচালনা করে। তাই দেখা যায়, আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এ দেশে প্রথম আসেনি, আগে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। কেননা, ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেলে সামরিক বিজয় সহজেই হয়ে যাবে। এ এলাকার জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তা ছিল মূলত তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা হেফাযত করার লড়াই। তাদের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শত শত বছর স্থায়ী হয়। 'স্বর্গ রাজ্যে' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের যে অসংখ্য কাহিনী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি আর্য সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের কাহিনীকে এসব আর্য সাহিত্যে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে কোন মানবগোষ্ঠীকে এমন নোংরা ভাষায় চিহ্নিত করার নযীর পাওয়া যাবে না। উইলিয়াম হান্টার তার 'এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' বইয়ে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজনিত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তীতে।... যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদেরকে প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে।"

সাংস্কৃতিক সংঘাত

কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' বইয়ে দেখিয়েছেন : তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। বাংলা ও বিহারের জনগণ আর্য-অধিকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাও ছিল ধর্মভিত্তিক তথা সাংস্কৃতিক।

আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম তথা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে জেগে ওঠা এই এলাকার সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের সংক্ষোভের তোড়ে উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলোর আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল।

বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এদেশে আর্য-প্রভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকেই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। তারপর চার ও পাঁচ খ্রিস্টাব্দের গুপ্ত শাসনামলে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।

মৌর্য বংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। অশোকের যুগ পর্যন্ত এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ছিল না। কিন্তু তারপর তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটে। হিন্দু দেব-দেবীরা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা লাভ করতে শুরু করে।

বৌদ্ধ ধর্মের এই বিকৃতি সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডস 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইয়ে লিখেছেন :

> "Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of the Buddha into a Divine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu partheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu."

সতিশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

> "যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে ইহা পুঁতিয়া রাখিতেন। .... উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাঁহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়।"

অর্থাৎ হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে এভাবে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়েছিল। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিল না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেল নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তারপর বুদ্ধের চরণ দেখা গেল। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসল। এভাবে ধীরে ধীরে এমন সময় আসল, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকল।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ শুরু হয়। আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবল বেগে আছড়ে পড়ে এখানে। এর মোকাবিলায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা ও বিহারের জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এ সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর জনগণের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ শক্তিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন :

> "আর্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফলাফল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)

এ আন্দোলনের তোড়ে বাংলা ও বিহারে আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল। আর্য-দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পুব-সীমানার রাজ্যগুলো শুধু মুক্তই হয়নি, শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা অনার্য রাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত জনজাগরণের শক্তিতেই শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের

শূদ্র-পুত্র মহাপদ্মনন্দ ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করে সমগ্র আর্যাবর্ত অনার্য অধিকারে এনে 'একরাট' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

বাংলাদেশেই আর্যবিরোধী সংগ্রাম সবচে প্রবল হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন :

> "সেমিটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর পুরুষ হিসেবে এ এলাকার মানুষের তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভবত তাদের একটি অংশ আর্য আগমনকালে তৌহীবাদের সাথে জড়িত ছিল। এ কারণেই শের্কবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলতে থাকে।" (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪)

জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতমের জীবনধারা এবং তাদের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ অনেক গবেষক মনে করেন যে, তারা হয়তো বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন :

> "জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরূপণ করে যে, বেদবিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।" (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)

মওলানা আবুল কালাম আযাদ দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ কখনো নিজেকে ভগবান দাবি করেননি। অশোকের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধ-মূর্তির প্রচলনও কোথাও ছিল না। প্রতিমা পূজাকে সত্যের পথে এক বিরাট বাধা গণ্য করে সেই অজস্র খোদার খপ্পর থেকে বুদ্ধ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করে দিব্যজ্ঞানলাভ ও সত্য-সাধনায় মুক্তি নিহিত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বাংলায় দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে দীর্ঘ দিন আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

এরপর খ্রিস্টীয় চার ও পাঁচ শতকে গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক হিন্দু ধর্মের কিছুই প্রসার হয়নি। ষষ্ঠ শতকের আগে বঙ্গ বা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি। উত্তর-পূর্ববাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠে। পঞ্চম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়। তা থেকে ড. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, তখন বাংলার আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। অযোধ্যাবাসী ভিন প্রদেশী ব্রাহ্মণ, শর্মা বা স্বামী, বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঙি নামে ব্রাহ্মণেরা জেঁকে বসেছিল :

> "বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, কেউ শাখাব্যায়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউ বা সামবেদীয়, কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব, বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌন্ডিন্য। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌছল।" (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩২)

সাত শতকের একেবারে শুরুতে গুপ্ত রাজাদের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ্য-শৈবধর্মের অনুসারী শশাংক রাঢ়ের রাজা হয়ে পুন্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে তিনি বৌদ্ধ নির্মূলের নিষ্ঠুর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা শশাংক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন। তিনি আদেশ জারি করেন :

> "সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" (রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, পৃষ্ঠা ১২৪)

সাত শতকের শেষার্ধ থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘোর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ 'মাৎসান্যায় যুগ'। এ যুগে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের শিথিলতার সুযোগে আর্য-ব্রাহ্মণেরা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মাৎস্যন্যায়ের এ অন্ধকার যুগেই এদেশে সংস্কৃত ভাষাও মাথা তোলে।

পাল আমল : বৌদ্ধ সংস্কৃতির আয়ু বৃদ্ধি

দীর্ঘ এক শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে আট শতকের মধ্যভাগে গরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে গৌড়-বঙ্গ-বিহারে বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল শাসনের সূচনা হয়। পাল শাসনের চারশ' বছর ছিল এদেশের মানুষের গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এ আমলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার

ও সংঘারাম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। কয়েকটি ছাড়া সকল মহাবিহার ছিল বাংলাদেশে। দশ শতকের শেষভাগের জ্যেষ্ঠজেতাবীর বাড়ি ছিল উত্তর বঙ্গে। তার ছাত্র বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৩৫) জ্ঞানরাজ্যের এক বিশ্ববিশ্রুত নাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রও ছিলেন বাংলাদেশের অধিবাসী। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক। জনগণের মুখের ভাষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ যুগের আরেক গৌরব। এ যুগ ছিল বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল।

বাংলার পাল-রাজত্ব চারশ' বছর স্থায়ী হয়। গৌড়-বঙ্গে পাল শাসন চলাকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সমসাময়িক আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তিপুঞ্জ সুলতান মাহমুদের হামলায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল। ফলে পাল শাসন তার ভৌগোলিক সীমান্তে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব থাকে। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত পাল শাসনে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম এ সময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে। পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ু আরো চার-পাঁচশ' বছর বৃদ্ধি পায়।

পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির মিল-সমন্বয়ের স্লোগান দেয়। বহিঃসীমান্তে তাদের মিত্ররা সাময়িকভাবে সুবিধা করতে না পারলেও ব্রাহ্মণদের এই চতুর কৌশল বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় তারই বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন :

> "পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।" (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯)

এ সময় পাল রাজারা অনেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আর তাদের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকর্মে নিজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশেষত দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হলো, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় নয় শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যেকার। এই সমন্বয় ছিল এক তরফা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই গড়ে উঠেছিল সবকিছু। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় :

> "এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল।... বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল।" (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৫১)

তথাকথিত এই মিল-সমন্বয়ের আদর্শ বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছিল, তাদের জাতিসত্তাকে করে তুলেছিল অন্তঃসারশূন্য,

আর রাষ্ট্রসত্তাকে করে তুলেছিল বিপন্ন। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সীমানা হেফাযত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকেরা রেখে গেছেন।

সেন শাসন : ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য

পাল-রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটদেশীয় চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বর্ণের সেনরা বাংলাদেশ শাসন করে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বারো শতকের শুরুতে রাঢ়-এর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করে সামন্তরূপে জেঁকে বসেন। পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার এই সুযোগে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (মৃ. ১১৫৮) এখানে প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা করেন। তার রাজধানী ছিল বিজয়পুর। বঙ্গের বিক্রমপুর ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী। শিব-এর পূজারী বিজয় সেন ও তার পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধারায় কুলীনপ্রথাভিত্তিক বর্ণাশ্রমবাদী সমাজের ভিত রচনা করেন। তখনকার অবস্থা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন :

> "সেন শাসনামলে দেখতে দেখতে বাংলাদেশে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল। নদ-নদীর ঘাটে-ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পুণ্য-স্নানার্থীর মন্ত্র-গুঞ্জরণ, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতের অনুষ্ঠান, জনগণের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানা স্তর-উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা— এক কথায় সমস্ত রকম সমাজ-কর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। সে আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে, মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।" (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)

সেন আমলে বর্ণাশ্রম প্রথা পুরোপুরি চালু হলো। উৎপত্তি হলো ছত্রিশ জাতের। যারা উৎপাদনের সাথে যত বেশি সম্পর্কযুক্ত, তাদের স্থান হলো সমাজে ততো নীচুস্তরে। যারা যতো বেশি উৎপাদন-বিমুখ, অন্যের শ্রমের ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, যত বেশি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী, সমাজে তাদের মর্যাদা হলো তত উপরে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। এভাবে সেন-বর্মন শাসিত বাংলাদেশে একটি সর্বভুক পরগাছাশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম হয়।

পাল আমলে সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণেরা তথাকথিত মিল-সমন্বয়ের কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেন-বর্মন পর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তথাকথিত সমন্বয়ের মুখোশ আর রাখল না। তারা স্বমূর্তিতে আগ্রাসনের দাঁত-নখ ব্যাদান করে রাজপথ আগলে দাঁড়াল। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি যে উদারতা দেখান হয়েছিল, তার বদলা হিসেবে ব্রাহ্মণবাদী সেনরা বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করল নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান। সে নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। 'ডিসকভারিজ অব লিভিং বুদ্ধইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন :

> "যে জনপদে (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১৫৫০ ঘর ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিশ বছরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল, তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে।" (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা ১১-১২)

ভারতে তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন :

> "ভারতের মাটি ও আবহাওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা মৌসুমী ফুলের মতই অবলুপ্ত হয়নি। এই পতন ও এই অবলুপ্তি অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা নয়— সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ভারত-ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের অবলুপ্তি এর আয়ুষ্কালের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি নয়, এটা কঠোর হস্তের একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড...। ... আমি শুধু বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার ও বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসস্তূপগুলোর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা উল্লেখ করব যে, ঐ সকল ধ্বংসস্তূপই বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি গঠনের সাধনা ও সিদ্ধি এবং বিরুদ্ধ শক্তি কিরূপ নির্মম হস্তে সে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সমাহিত করেছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ—জীবন্ত স্বাক্ষর।" (টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃষ্ঠা ২১)

সেন-বর্মন শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধ জাতিসত্তার সাথে এ এলাকার জনগণের মুখের ভাষার অস্তিত্বের সংকটও সৃষ্টি হয়েছিল। সেই চরম দুর্গতির বিবরণ দিয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন :

> "পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া

নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংগালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যজাত বাংগালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাংগালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাংগালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।" (প্রাচীন বাংগালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯-১০)

সে আমলের বাংলা ভাষার কিছু নমুনা ১৯০৭ সালে ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। চর্যাপদ নামে পরিচিত এই চারটি পুঁথি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন শুধু নয়; আমাদের পূর্বপুরুষদের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামের কাহিনী এবং তাদের রুদ্ধ হাহাকার এসব প্রাচীন পুঁথির পাতায় কান পাতলে শোনা যায়।

প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন ধারা

সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে দেশবাসীর জীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুম জনগণের পক্ষের শক্তি হিসেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইসলাম প্রচারক আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণ। বাংলাদেশে রাজা শশাংকের সময় থেকেই ইসলাম প্রচারকদের আগমনের সূচনা হয়। এরপর মাৎস্যন্যায় যুগের ঘন অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল দেশের নানা জায়গায়। ইসলাম প্রচারকগণ নিপীড়িত জনগণকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়ান বিক্রমপুরে, পুন্ড্রবর্ধনে, রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে।

দশ ও এগারো শতক থেকে অসহায় দলিত মানুষের কানে ইসলামের মুক্তিবাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল দ্রোহাত্মক উচ্চারণ।

দ্বাদশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগের বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাঙ্গেয় উপত্যকার অভ্যন্তরে এক নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলে। আর্যদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল, ইসলামের দ্রোহাত্মক বাণী তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল।

একেকজন ইসলাম প্রচারক জনগণের কাছে আবির্ভূত হন তাদের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে। প্রচারকদের গড়ে তোলা মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকাগুলো নির্যাতিতের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের লঙ্গরখানা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় ও চাহিদা পূরণের কেন্দ্র এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্গ হিসেবে পরিচিত হয়।

৩.

মুসলিম শাসন : বাংলার ইতিহাসের গঠনমূলক যুগ

ইসলাম প্রচারক আলেম, দরবেশ ও মুজাহিদগণ জনগণকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রতি জনগণের সমর্থন গড়ে ওঠে। জনসমর্থনের সে দৃঢ় ভিত্তির ওপর ১২০৩ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন হয় ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ঐতিহাসিক বিজয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু লামা তারানাথ তাঁর ষোল শতকের বিবরণীতে জানান, বৌদ্ধরা মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দিত করেছিল এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীকে বিজয়ে সাহায্য করেছিল। শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধরা মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে কিছুটা শান্তি লাভ করেছিল।

লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুর্নিয়া শহর, দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পুব ও দক্ষিণ-পুবে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে।

বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়, এখানে তা উদ্দেশ্যও নয়। তবে এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলার মুসলিম বিজয় ছিল জনগণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামেরই সাফল্য, যা তাদের সামনে বহুল প্রত্যাশিত এক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ভারতে মুসলিম বিজয় সম্পর্কে গোপাল হালদার মন্তব্য করেন :

> "ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির... এ পরাজয় রাষ্ট্র-শক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদার নীতি ও আত্ম-সচেতনতার কাছে।... কারণ ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে তুলে নেয়।" (সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৯৬)

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির ব্যর্থতা ও ইসলামী সংস্কৃতির বিজয়ের কারণ চিহ্নিত করে কমরেড এম. এন. রায় 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> "ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি বরং তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে। সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ-শক্তি তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তার ফল হলো এই যে, বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচার-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ডুবে গেল। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এজন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভীড় করে দাঁড়াল....। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করল। তার কারণ তার পিছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শন সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃঙ্খলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।" (পৃষ্ঠা ৬১-৬২)

মুসলিম শাসন আমল বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ হিসেবে ঐতিহাসিকদের বিবেচনা লাভ করেছে। এ জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ যুগেই একটি উন্নত ও সংহত রূপ লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে এ যুগেই বাংলার জনগণ একটি আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ হয়। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তিও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. এম এ রহীমের মন্তব্য :

> "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ প্রদেশে আর কয়েক শতকের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন অব্যাহত থাকত, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত এবং অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)

গণেশের রাজনৈতিক 'অভ্যুত্থান'

১২০৬ সালে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ইনতিকালের পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত ১৩২ বছরে অন্তত ২৩ জন মুসলিম শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন। দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের প্রতি এই শাসকদের আনুগত্য ছিল নামমাত্র। ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেই নামমাত্র আনুগত্যের বন্ধনও ছিন্ন হয়। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত এই দু'শ বছর স্বাধীন সুলতানী শাসনামল হিসেবে চিহ্নিত। শের শাহের সময় (১৫৪০-৪৫) কয়েক বছর বাংলাদেশ দিল্লীর সাথে যুক্ত ছিল। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত দাউদ খান কররানী স্বাধীন সুলতানরূপেই বাংলাদেশ শাসন করেন। স্বাধীন সুলতানী শাসনামলের মধ্যভাগে দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার জমিদার

গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ শাহাদাতবরণ করেন। এরপর ১৪১০ থেকে ১৪১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ইলিয়াসশাহী বংশের সাইফউদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহ একের পর এক বাংলার শাসনমঞ্চে আবির্ভূত হন। গণেশের চক্রান্তে তারা সকলেই নিহত হন। শিহাবউদ্দীনকে হত্যা করার পর গণেশ তাঁর বালকপুত্র আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহকে রাজা হিসেবে খাড়া করে এ সময় নিজেই কার্যত রাজা হয়ে বসেন। এরপর যখন বুঝতে পারেন, কাউকে আর শিখণ্ডী না রাখলেও চলবে, তখন ফিরূজকে হত্যা করে গণেশ ১৪১৫ সালে সিংহাসন দখল করেন।

রাজা গণেশের সিংহাসন দখলের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের অবসানকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের দু'শতাধিক বছরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। গণেশ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করেন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়ায় তার প্রধান লক্ষ্য। রমেশচন্দ্র মজুমদার গণেশের স্বল্পকাল-স্থায়ী শাসনামলকে 'হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা' বলে উল্লেখ করেন। সে সময়ের বহু ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশকে গণেশ পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে তিনি পরিণত করেন কাচারি বাড়িতে।

রাজা গণেশের নেতৃত্বে বর্ণহিন্দুদের এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মোকাবিলায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেন। বাংলার এই ভয়াবহ দুর্দিনে শায়খ আলাউল হকের পুত্র সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিম নূর কুতুব-উল-আলম মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর আহ্বানে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কী এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিপদ বুঝে গণেশ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। গণেশের পুত্র যদু নূর কুতুব-এর কাছে ইসলাম কবুল করেন এবং জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার শাসক হন।

শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলন

গণেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু করে। সুলতানী আমলের শেষদিককার বিদ্যোৎসাহী মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম শাসকদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত থেকে ভাষান্তর ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে' সমৃদ্ধ ভাষা আরবীতে তখন তাফসীর, হাদীস, উসুল, তর্কবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্থরাজি মজুত ছিল। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের উপযোগী

এই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার জনগণের সামনে তুলে ধরার কোন ব্যবস্থাই এ সময় করা হয়নি। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষা বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। কিন্তু তাদের তৈরি বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করল, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ছিল না।

সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট মঙ্গল-কাব্যের প্লাবনে সাধারণ মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাষ্ট্রকে নির্মাণ করার পাশাপাশি জাতি গঠনের কাজে শাসকদের সম্যক সচেতনতার অভাবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষভাগে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়।

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এমনি পটভূমিতে পরিচালিত হয়েছিল। চৈতন্য সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ'-এ লিখেছেন :

> 'তিন শত বছরের মধ্যে বাঙালি ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই— মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।' (পৃষ্ঠা ২৬১)

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সময় যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। বহু হিন্দু লেখক চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে প্লাবিত করে।

এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় কোন কর্মপন্থা সে সময় মুসলিম সমাজে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। এ শূন্যতার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধেরও জন্ম হয়। এ কারণে বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের বিরাট মিছিলে এক শ্রেণীর মুসলমান কবিও গা ভাসিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভাষায় এরা ছিলেন 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'।

প্রেম ও ভক্তির ধর্ম প্রচারের নামে চৈতন্যের নেতৃত্বে 'পাষণ্ডি' বা মুসলমান সংহারের আওয়াজ তোলা হয়। এ ছাড়া চৈতন্যের ধর্মাদর্শের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল আদিরস। স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমকেই চৈতন্য বেশি ঝাঁঝালো মনে করতেন। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি এবং রজকিনী প্রেমের আদিরস সঞ্চার করে চৈতন্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটি বড় অংশকে ইসলামের প্রভাব-সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হন। এ সাফল্য প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন :

> "শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে জাতিভেদের জন্যই কিছু উঁচু-বর্ণের হিন্দু ব্যতীত সকলেই মুসলমান হয়ে যেত।"

হিন্দু সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার। শ্রী চৈতন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসার বাণী প্রচার করেন। তা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার জন্ম দেয়। বাংলায় সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির এটি ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। শ্রীচৈতন্যের বড় হাতিয়ার ছিল হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি, আর পরকীয়া রজকিনী প্রেমের আদিরস সঞ্চার। চৈতন্যের হিংসানীতির শিকার হয়েছিলেন নবদ্বীপের কাজী। কাজীর বাড়িতে হামলা চালানোর মিছিলে চৈতন্য নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এ হামলা হলো 'উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রথম ঘটনা'।

চৈতন্য তার শিষ্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামক দুই ভাইয়ের সাহায্যে সুলতান হোসেন শাহের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করেন। এ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হোসেন শাহও চৈতন্যের আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

চৈতন্যপন্থিদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে চৈতন্যের ব্যর্থতার ওপর আলোকপাত করে মওলানা আকরম খাঁ লিখেছেন :

> "ছোলতান হোসেনের প্রাথমিক দোষ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া, গৌড় রাজ্যের সাধু-সন্ন্যাসীরূপী বৈষ্ণব জনতা বাংলাদেশ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোছলেম শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য যে গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ছোলতান ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথাসময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।... চৈতন্য দেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়াই বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে এমন আশ্চর্যরূপে উধাও হইয়া গিয়াছেন যে, ভক্তরাও তাহার শেষ জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সংবাদই দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেছেন অন্তর্ধান, কেহ বলিতেছেন সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ ইত্যাদি।" (মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃষ্ঠ ১১০)

সাঁইত্রিশ বছরের আফগান শাসন ও স্বাধীন বারো ভূঁইয়া

স্বাধীন সুলতানী আমলের পর ১৫৩৯ সালে শেরশাহ্ সূর বাংলায় আফগান শাসন কায়েম করেন। ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত আফগানদের ৩৭ বছরের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই আমলে মুসলিম জনজীবনকে ইসলামী আদর্শের আলোকে সংস্কারেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শের শাহ্ বাংলার তিনটি ইকলিম বা প্রদেশ 'ইকলিম সোনারগাঁও', 'ইকলিম লাখনৌতি' ও 'ইকলিম সাতগাঁও'-কে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায় ভাগ করেন।

১৫৭৬ সালে বাংলায় আফগান শাসনের অবসানের পরও প্রায় তিন যুগ পর্যন্ত পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৬০৮ সালের আগে পর্যন্ত বাংলায় মোগলদের কর্তৃত্ব ছিল একেবারেই সীমিত এলাকায়, উত্তর

ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি সেনা-ছাউনিকে ঘিরে। বাকি এলাকায় মসনদে আ'লা ঈসা খাঁ, ওসমান খাঁ লোহানী, মাসুম খান কাবুলী প্রমুখ পাঠান মুসলিম নায়কগণ নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। আকবরের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ এবং তার দ্বীন-ই-ইলাহী নামক নতুন ধর্মমত প্রচারের বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাজী সাহেবের ফতওয়া বাংলার বার ভূঁইয়াদের মোগলবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। বাংলার পাঠান নায়কগণ ধর্মদ্রোহী সম্রাটের বিরুদ্ধে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই ফতওয়া তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে জনসমর্থনের ভিত্তি রচনায়ও সহায়ক হয়। আকবরের জীবদ্দশায় এই এলাকায় মোগলদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

মোগল কর্তৃত্ব : ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর অন্যতম অনুসারী সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতি (১৬০৮-১৬১৩) বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১০ সালে তিনি আকবর নগর (রাজমহল) থেকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) রাজধানী স্থানান্তর করেন।

ঢাকার বিখ্যাত নবাবদের মধ্যে শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৮০-৮৮) এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম-উস-শানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে শায়েস্তা খান ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবাদার মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর থেকে রাজধানী মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন। এ কারণে পরবর্তী স্বাধীন শাসকগণ মুর্শিদাবাদের নবাব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে শের শাহের আমলের ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় পুনর্বিন্যাস করেন। মুর্শিদ কুলী খানের পর সুজাউদ্দীন (১৭২৭-৩৯), সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০), আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬), সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭) নামমাত্র মোগল কর্তৃত্বের অধীনে কার্যত স্বাধীন নবাবরূপে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন পরিচালনা করেন।

৪.

মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমি

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা আকস্মিকভাবে ঘটেনি। এখানে মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমিও তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। পনের শতকের প্রথমার্ধে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে রাজা গণেশের রাজনৈতিক উত্থান-প্রচেষ্টা এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা দীর্ঘদিন থেকেই বাংলায় মুসলিম শাসন উৎখাতের স্বপ্ন দেখেছিল। সামনের সারিতে এসে নেতৃত্ব গ্রহণের হিম্মত তাদের ছিল না। তারা সব সময়ই ষড়যন্ত্রের পেছন দরজা ব্যবহারের অপেক্ষায় ছিল।

এই পটভূমিতে ১৪৯৮ সালের ২০ মে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ভারতের মালাবার উপকূলে এসে পৌছেন। মুসলিম বণিকগণ তাকে সেখানে বাধা দেন। কিন্তু কালিকটের হিন্দু রাজা জামুরিন তাকে অভ্যর্থনা জানান ও নিজ প্রাসাদে আশ্রয় দেন। ছয়মাস পর ভাস্কো ডা গামার মাধ্যমে পর্তুগালের রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে জামুরিন এই ঐশ্বর্যশালী দেশে বাণিজ্য করার জন্য পর্তুগীজ নাবিকদের আমন্ত্রণ জানান। এভাবে ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনধারার সূচনা হয়।

১৫০২ সালে ভাস্কো ডা গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসে কোচিন ও কান্নানোরের রাজার সহযোগিতায় জামুরিনের রাজ্যে হামলা করেন। ১৫০৫ সালে পনের শ' নাবিকসহ ফ্রান্সিককো দ্য আলমেডিয়া এদেশে আসেন। মালাবার উপকূলে বণিক ও হজ্জযাত্রীদের জাহাজগুলি এই পর্তুগীজ দস্যুদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ১৫০৯ সালে আল ফানসো দ্য আল বুকার্ক মালাবার উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫১০ সালে গোয়া অধিকার করে তিনি উপমহাদেশে প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৫১০ থেকে ১৫১৫ সালের মধ্যে কোচিন, দমন, দিউ পর্তুগীজ অধিকারে চলে যায়।

এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে তরবারি

ইউরোপে ক্রুসেডের পটভূমিতে পর্তুগীজরা ছিল চরম মুসলিমবিদ্বেষী। সেই পটভূমিতে পর্তুগীজরা মুসলিম ভারতে এসেছিল এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে।

ইউলিয়াম হান্টারের ভাষায় :

> 'They were not traders, but knighterrant and Crusaders..... Their national temper had been formed in their contest with the Moors (Muslims) at home.' (A Brief History of the Indian People, 1868. P-167)

ইংরেজ বণিকরা এদেশে প্রথম আসে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। ১৬০২ সালে ডাচ, ১৬০৪ সালে ফরাসী, ১৬১২ সালে দিনেমার, ১৬৩৩ সালে স্পেনীয়, ১৭২৩ সালে অস্ট্রিয়, ১৭৩১ সালে সুইডিশ এবং ১৭৫০ সাল রুশীয় বণিকরা বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে এদেশে আসে।

১৬২০ সাল থেকে ইংরেজ বণিকরা সুরাট, আজমীর ও পাটনায় সীমিত আকারে ব্যবসা করছিল। ১৬২৪ সালে তারা উড়িষ্যার বালাশোরে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৩৪ সাল থেকে তারা বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ১৬৫১ সালে ইংরেজরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। তখন থেকেই তারা বর্ণহিন্দু ব্যবসায়িক মিত্রদের সহযোগিতা নিয়ে এদেশের রাজনীতির দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে।

১৬৮২ সালে উইলিয়াম হেজেজ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট নিযুক্ত হন। এরপর বাণিজ্যিক শর্ত লঙ্ঘন, সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ, হুগলীতে দুর্গ নির্মাণ, কর প্রদানে কারচুপি, দেশীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ এবং বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কর্মচারীদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৮৬ সালে ইংল্যান্ড থেকে সৈন্য বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছে বাংলার সুবাদার ও ভারত সম্রাটের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য।

এর আগে ১৬৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বার্ষিক কুড়ি পাউন্ড বেতনের রাইটার-এর চাকরি নিয়ে ভাগ্যান্বেষী জোব চার্নক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজার কুঠিতে যোগ দেন। দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৬৮৫ সালে তিনি হুগলী কুঠি'র চীফ এজেন্ট নিযুক্ত হন। হুগলী কুঠির বকেয়া শুল্ক বাবদ তেতাল্লিশ হাজার টাকা আদায়ের জন্য ঢাকার সুবাদার জোব চার্নকের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করেন এবং তাকে ঢাকায় তলব করেন। চার্নক কাসিমবাজারে পালিয়ে যান। সুবাদারের লোকেরা তাকে সেখানে ধাওয়া করলে রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে তিনি হুগলীর কুড়ি মাইল দক্ষিণে জঙ্গলাকীর্ণ সুতানুটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। ১৬৮৭ সালে জোব চার্নক সুতানুটি থেকে পালিয়ে যান মাদ্রাজে।

ইংরেজদের নানা কুকর্মে রুষ্ট হয়ে শায়েস্তা খান বাংলায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খানের স্থলে ইবরাহীম খাঁ সুবাদার হন। ইংরেজ বণিকরা অতীত অপকর্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে বহু আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধা পুনরায় ফিরে পায়।

১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নক তৃতীয় বারের মতো সুতানুটির ঘাটে অবতরণ করেন। কৌশলগত যাবতীয় সুবিধার দিক বিবেচনা করে তিনি সেখানেই কেন্দ্র স্থাপন করেন।

গঙ্গাতীরের ধান ক্ষেত, কলাবাগান, জলাভূমি ও কয়েকটি কুঁড়েঘর নিয়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলকাতা নামক তিনটি স্যাঁতস্যাতে জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামকে কেন্দ্র করে তখন থেকেই ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইংরেজ 'নাবিক, বণিক ও লোফার' এবং তাদের এদেশীয় বর্ণহিন্দু কোলাবোরেটরদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে বেড়ে উঠতে থাকে শহর কলকাতা। এ. কে. রায়ের ভাষায় :

> "The fair dealings of the English traders with Hindu marchatns and the lattter's faithfulness to the Company became the talk of the day." (A Short History of Calcutta)

এ ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিতে চারদিক থেকে যারা ভিড় করতে লাগলো তাদের পরিচয় হলো–

> "They were mainly Hindus because it was easier to manage the submissive Hindus than the refractory Muslims." (History of the Freedom Movement of India)

আঠার শতকের শুরু থেকে ইংরেজ বণিক ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্র ধরে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে তাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। তারা সকলেই ছিল হিন্দু। ১৭৩৯ সালে কাসিমবাজারে কোম্পানির সকল এদেশীয় কর্মচারীর পরিচয়ও ছিল অভিন্ন। এভাবেই ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রী গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসনের অবসান ছিল এ মৈত্রীজোটের অভিন্ন লক্ষ্য। এস.সি হিল তাঁর গ্রন্থ 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭'-এ প্রমাণপঞ্জীসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আলীবর্দী খান ১৭৪০ সালে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এর পর থেকেই তাঁকে একদিকে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয়, অন্যদিকে বাইরের সীমান্তে মারাঠা বর্গী ও রোহিলাদের সাথে লড়াই চালাতে হয়। এই দ্বৈত সংকটের সুযোগে ১৭৫৪ সালে ইংরেজরা কলকাতায় উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে।

ইংরেজ কর্মচারীদের তখনকার চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসন ধ্বংসের ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্র তখন পরিণত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চরম সুযোগ উপস্থিত হয়। তারা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে প্রথমে ইয়ার লতী**ফকে পরে** বিশেষ বিবেচনায় মীর জাফরকে শিখণ্ডী হিসেবে বেছে নেয়।

১৭৫৭ সালের ১ মে কলকাতায় ইংরেজ কমিটি তাদের বর্ণহিন্দু দালালদের সহায়তায় মীর জাফরের সাথে এগার দফা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। সেই ষড়যন্ত্রমূলক এগার দফা চুক্তির ভিত্তিতেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম বাগানে যুদ্ধ প্রহসনের মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন হয়। সেই সাথে লুপ্ত হয় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা এবং কালক্রমে ভারতবর্ষ– আসমুদ্র হিমাচল।

পলাশীর এই যুদ্ধকে কোন কোন হিন্দু লেখক 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে অভিহিত করেছেন। এখানে 'দেবতা' হলেন ক্লাইভ আর 'অসুর'রূপে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে জীবন দানকারী তরুণ নবাব সিরাজকেই চিহ্নিত করা হয়। পলাশীর শোকাবহ বিপর্যয়কে কলকাতায় 'পলাশীর বিজয়োৎসব'-রূপে পালন করা হয় এবং দুর্গাদেবীর অকাল-বোধনের মাধ্যমে বসন্তকালীন দুর্গোৎসবকে শারদীয় দুর্গোৎসবরূপে পালন করে ক্লাইভকে দেবতুল্য সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করা হয়।

মীর কাসিমের শেষ প্রতিরোধ

১৭৫৭ সালের ২৯ জুন পরাধীন দেশের পুতুল নবাবরূপে মসনদে বসেন মীর জাফর। ৩ জুলাই রাজকীয় শান-শওকতের সাথে দুইশ' নৌকা বোঝাই সোনা-চাঁদি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা পাঠানো হয় ইংরেজদের 'যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ' হিসেবে। এভাবেই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে নগর কলকাতার উত্থান ঘটে।

ইংরেজদের পৌনঃপুনিক টাকার দাবি মিটাতে মীর জাফরের রাজকোষ শূন্য হয়। ইংরেজদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মীরজাফর ওলন্দাজদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইংরেজরা মীর জাফরকে সরিয়ে দিয়ে ১৭৬৫ সালের অক্টোবর মাসে তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসায়।

মীর কাসিম তার অতীত ভুলের কাফ্‌ফারা আদায় করতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেন। দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তিনি। ফলে ইংরেজদের সাথে শুরু হয় প্রত্যক্ষ লড়াই। ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ হলো গিরিয়ায়, উদয়নালায়, পাটনায়।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম আশ্রয় নিলেন অযোধ্যায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন তিনি। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী বেণী বাহাদুর ও বেনারসের বলওয়ান সিংহ ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাতের পুরনো খেলায় লিপ্ত হয়। ফলে মীর কাসিম ও সুজাউদ্দৌলার যৌথ বাহিনী ১৭৬৪ সালের এপ্রিলের এক যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়।

এরপর ১৭৬৪ সালে ২২ অক্টোবর দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যার নবাব ও মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনী বক্সারে ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। এই যুদ্ধের সময়ও পুনরাবৃত্তি হলো একই নাটকের। সম্রাটের দেওয়ান সেতাব রায়, অযোধ্যার নবাবের মন্ত্রী বেণী

বাহাদুর ও মীর কাসিমের খ্রিস্টান সেনাপতি মার্কাট ও আরাটোনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

বখশারে বাংলার জনগণের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেল। বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ক্যার্যত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ক্লাইভ এক চুক্তির ভিত্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রশাসনের ফরমান আদায় করে নিলেন।

অন্য দিকে ভগ্ন-হৃদয় মীর কাসিম দীর্ঘ বারো বছর মধ্য-ভারত সফর করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান। ১৭৭৭ সালের ৬ জুন দিল্লীর আজমিরী দরজার বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফিররূপে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন মীর কাসিম। তাঁর মাথার নিচে রাখা নামাঙ্কিত চাদর দেখেই বাংলার এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত নবাবকে সেদিন শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

১৭৯৬ সালে ঢাকার নামেমাত্র নবাব শামসউদ্দৌলা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারত, আফগানিস্তান ও পারস্যের মুসলমান শাসকদের সাথে গোপন যোগাযোগের ভিত্তিতে ওমানের মস্কট থেকে আরব জাহাজে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে এবং সৈন্যরা শামসউদ্দৌলার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই 'ষড়যন্ত্রের' আভাস পেয়ে ১৭৯৯ সালে শামসউদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে। নবাব শামসউদ্দৌলা ১৮৩১ সালে মারা যান।

৫.

পলাশী-উত্তর বাংলার চালচিত্র

১৭৫৭ সালে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য-বিপর্যয় এবং ১৭৬৪ সালে বখশারে মীর কাসিমের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক এক বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে।। ফলে অতি অল্প সময়ের লুণ্ঠন-শোষণে বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতিসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্র। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয়। বিশেষ করে ভারতের পুরাতন শাসক মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথা তুলতে না পারে সেজন্য সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়।

ইংরেজ ও তার এদেশীয় দালালদের লুণ্ঠন

ইংরেজরা দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের আনুষ্ঠানিক ফরমান আদায় করে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট তারিখে। কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকেই তারা শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেছিল। মীর জাফরকে 'পুতুল নবাব' সাজিয়ে লর্ড ক্লাইভ শুরু থেকেই 'প্রকৃত নবাব' সেজে বসেছিলেন। আর এই পুতুল নবাবীর সূচনাকাল থেকেই ইংরেজরা এদেশে ইতিহাসের নজীরবিহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়েছিল।

খোদ লর্ড ক্লাইভ পলাশীর 'যুদ্ধ জয়ের' বখশিশ হিসেবে মীর জাফরের কাছ থেকে ২ লাখ ৩৪ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে রাতারাতি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হন। মীর জাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছয়জন কর্মচারীকে ১,৫০,০০০ পাউন্ড উৎকোচ প্রদান করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ পাউন্ড ঘুষ আদায় করেন। (পি. রবার্টস : হিস্টরী অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮; ড. এম এ রহীম : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৯)

কোম্পানির ও কলকাতার অধিবাসীদের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে এবং সৈন্য ও নৌবহরের ব্যয় বাবদ কোম্পানি আদায় করে মোট ২৫,৩১,০০০ পাউন্ড। তাছাড়া মীর জাফর ইংরেজ কর্মকর্তাদের খুশি করতে ৬,৬০,৩৭৫ পাউন্ড উপঢৌকন দেন। বিভিন্ন ইংরেজ

কর্মচারী মীর জাফরের কাছ থেকে চব্বিশ পরগণা জেলার জমি ছাড়াও ৩০ লাখ পাউন্ড 'ইনাম' গ্রহণ করেছিল। ১৭৫৯ সালে ক্লাইভকে ৩৪,৫৬৭ পাউন্ড বার্ষিক আয়ের দক্ষিণ কলকাতার জায়গীর প্রদান করা হয়। (ব্রিজেন কে গুপ্ত : সিরাজউদ্দৌলা এন্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃষ্ঠা ৪১)।

ইংরেজদের বিভিন্ন রূপ টাকার দাবি মেটাতে মীর জাফর রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছিলেন। মীর কাসিম এই ঋণ পরিশোধ এবং মসনদের বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীদেরকে ২০০,০০০ পাউন্ড দিয়েছিলেন। (ড. এম এ রহীম : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬)

মীর জাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলা ১৭৬৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর মসনদ লাভের জন্য কোম্পানির কর্মচারীদেরকে যে ঘুষ দেন তার পরিমাণ ছিল ৮,৭৫,০০০ টাকা। রেজা খান ২,৭৫,০০০ টাকার উৎকোচের বিনিময়ে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবাবের নবাব-নায়িম নিযুক্ত হয়েছিলেন। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০)

উৎকোচ নামক দুর্নীতি এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে আমদানী করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত মাত্র দশ বছরে ষাট লাখ পাউন্ড আত্মসাৎ করেছিল। এ কথা ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। (Fourth Parliamentry Report 1773, P-535; সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৯)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অর্থ বিলাতে নিয়ে যায়। ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলে তিনি নিজ আচরণ সমর্থন করে বলেন :

> "পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তা আপনারা ভেবে দেখুন। একজন বড় রাজার ভাগ্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। একটি সমৃদ্ধ নগর আমার দয়ার প্রতীক্ষায় আছে। আমার মুখের সামান্য হাসিতে কৃতার্থ হওয়ার জন্য ধনী মহাজনরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। আমার দুই পাশে স্বর্ণ মণিমুক্তায় পূর্ণ সিন্দুকের সারি এবং এগুলি কেবল আমারই জন্য খোলা হয়েছে। (পার্লামেন্ট কমিটির) সভাপতি মহোদয়, এ মুহূর্তে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, তখন আমি কিভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলাম।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনে ইংরেজরা একা ছিল না। তাদের পাশে ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের সহচর এদেশী দালাল, গোমস্তা ও বেনিয়ানগোষ্ঠী। তাদের শোষণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ব্যারিংটন মেকলে স্বয়ং মন্তব্য করেছেন :

> "কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য নয়, নিজেদের জন্য, প্রায় সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

তারা দেশী লোকদের উৎপন্ন দ্রব্য অত্যন্ত কম দামে বেচতে এবং অন্যদিকে বিলাতি পণ্য খুবই চড়া দামে কিনতে বাধ্য করত। কোম্পানি তাদের অধীনে একদল দেশী কর্মচারী নিয়োগ করত। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে এলাকায় যেত, সে এলাকা ছারখার করে দিত। সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করত। ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার উচ্চপদস্থ (ইংরেজ) মনিবের শক্তিতে বলীয়ান। আর এই মনিবদের প্রত্যেকের শক্তির উৎস ছিল খোদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। (তাদের ব্যাপক লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে) শীঘ্রই কলকাতায় বিপুল ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত হলো। সেই সাথে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালো। বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্থ একথা ঠিক, কিন্তু এ ধরনের (ভয়ঙ্কর) শোষণ ও উৎপীড়ন তারাও কোনদিন দেখেনি।" (Macaulay : Essays on Lord Clive, P-63; সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০)

ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা লাভের আগে দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও তাদের পণ্য-ব্যবসা সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করতে পারেনি। এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কাঠামো অক্ষত রেখে তাদের এই ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল না। আগে যা কখনো সম্ভব হয়নি, পলাশীর পরে এখন তা সম্ভব হলো। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে নজীরবিহীন ক্ষিপ্রতার সাথে বাংলা ও বিহারের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের এই ভিত্তি ও কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

এই সমাজকে ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রক্রিয়া হিসেবে তারা—

ক. ভূমি-রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা চালু করে, এবং

খ. ভূমি-রাজস্ব হিসেবে ফসল বা উৎপন্ন দ্রব্য আদায়ের প্রচলিত পদ্ধতির বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

ইংরেজ প্রবর্তিত এই নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেন :

"এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আঘাতে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইল। বিহার ও বাংলা শ্মশান হইয়া গেল।" (সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০)

ইংরেজ শাসনের আগে এ দেশের শাসকরা সমগ্র গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। চাষী জমির ফসলের দ্বারা গ্রাম-সমাজের মাধ্যমে এই রাজস্ব আদায় করত। ইংরেজরা গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের

এ ব্যবস্থা লোপ করে কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং ফসলের বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের রেওয়াজ চালু করে। এভাবে এদেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ধ্বংস করে তারা সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থা নতুনভাবে গড়ে তোলার আয়োজন করে। কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশি খাজনা ও কর আদায় করে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এক নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এই জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজরা বাংলা ও বিহারের নিষ্ঠুরতম দস্যু সরদারদেরকে 'নাযিম' নিয়োগ করে।

নাযিম নামক এই দস্যুদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোম্পানির দলিলপত্র থেকে জানা যায়। বাংলা ও বিহারের রাজস্ব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ১৭৭২ সালের ৩ নভেম্বর ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন :

> "নাযিমরা জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশি পারে কর আদায় করে নিচ্ছে। জমিদাররাও নাযিমদের কাছ থেকে চাষীদের লুণ্ঠন করার অবাধ অধিকার লাভ করেছে। নাযিমরা আবার তাদের সকলের (জমিদার ও কৃষকদের) সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার রাজকীয় বিশেষ অধিকারের বলে দেশের ধন-সম্পদ লুট করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২)

১৭৬৫-৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর সে বছরই তারা প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি ২০ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে আদায়ের পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের রাজস্ব-নীতি ও ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

> "এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের ওপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চাপিয়ে বসে। এই পিরামিডের শীর্ষদেশে রহিল ইংরেজ বণিকরাজ, তার নীচে রহিল বিভিন্ন প্রকার উপস্বত্বভোগীর দলসহ জমিদারগোষ্ঠী। এই বিরাট পিরামিডের চাপে বাংলা ও বিহারের অসহায় কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২)

ব্যবসায়ের নামে 'প্রকাশ্য দস্যুতা'

বাংলার জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিপুল ভূমি-রাজস্ব, কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় করা ঘুষ, ব্যবসায়ের নামে ব্যক্তিগত লুণ্ঠন এবং এদেশের টাকা দিয়ে এখানে নামমাত্র মূল্যে পণ্য কিনে ইউরোপে চালান করা হতো। ফলে যে মুনাফা তারা লাভ করত, তার পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য রকম স্ফীত। এ দেশের জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাজস্বের টাকার একাংশ দিয়ে এ দেশেরই কারিগরদের তৈরি পণ্য-সম্ভার

নামমাত্র মূল্যে কেড়ে নিয়ে ইউরোপে চালান দিয়ে মুনাফা করা হতো বিপুল অংকের টাকা। সমুদয় গ্রাস করত 'কোম্পানি-লগ্নি'। এই অদ্ভুত লগ্নির চেহারা ছিলো :

"বাংলাদেশের জনগণের টাকা, বাংলার কারিগরদের তৈরি দ্রব্য, কিন্তু মুনাফা কোম্পানির। কার্লমার্কস, রেজিনাল্ড রেনল্ডস প্রমুখ লেখক এই 'ব্যবসায়ের' নাম দিয়েছেন 'প্রকাশ্য দস্যুতা।" (পূর্বোক্ত)

ব্যবসায়ের নাম ইংরেজ বণিক কোম্পানির এই দস্যুতার মুখে বহু শিল্প-কারিগর উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য নিজেদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। অনেকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩– এই ছয় বছরে কৃষকদের সাথে কারিগরদের একটি অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয়। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনল্ডস লিখেছেন :

> "ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকার বিশ্বখ্যাত মসলিনের এক তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ-পীড়নে অস্থির হয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।" (রেজিনাল্ড রেনল্ডস : সাহিব্স ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৫৪)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ

ইংরেজদের নয়া রাজস্বনীতির কারণে কৃষকরা খাজনার টাকা যোগাড় করার তাকিদে বছরের খাদ্য-ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা মুনাফা শিকারের সেরা সুযোগরূপে বেছে নেয় চালের মজুতদারীকে। তারা চালের একচেটিয়া ব্যবসা কুক্ষিগত করার জন্য বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ব্যবসা-কেন্দ্র খুলে ফসল ওঠার সাথে সাথে চাউল মজুদ করে রাখত। পরে সুযোগ বুঝে চাষীদের কাছে তাদেরই রক্ত পানি করা শ্রমের ফসল কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করত। তাদের এই একটি ব্যবস্থাই 'ভারতের শস্য-ভাণ্ডার' নামে খ্যাত, মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ, যেখানে মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ' বছর মানুষ কখনো দুর্ভিক্ষের সাথে পরিচিত ছিল না, সেই বাংলা ও বিহারকে দুর্ভিক্ষের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৭৬৯ সালে ফসল ওঠার সাথে সাথে ইংরেজরা বাংলা ও বিহারের সকল ফসল কিনে ফেলে। সারা বছর মজুদ করে রেখে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সাল) সে খাদ্য-শস্য কয়েকগুণ বেশি দামে বেচতে শুরু করে। কয়েক বছরের নিষ্ঠুর শোষণে সর্বস্বান্ত কপর্দকশূন্য কৃষক ও কারিগরদের পক্ষে এত চড়া দামে সে চাল কিনা সম্ভব ছিল না। ফলে বাংলা ও বিহারে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল এক কোটি পঞ্চাশ লাখ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত এই মহা দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ লেখক

ইয়ং হাসবেন্ড লিখেছেন :

"তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হলো চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এই পণ্যের জন্য তারা যে দাম চাইবে, তাই তারা পাবে। ... দেশে যা কিছু খাদ্য ছিল তা (ইংরেজ বণিকদের) একচেটিয়া দখলে চলে গেল। ... খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে লাগল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির-দুঃখময় জীবনের ওপর পতিত হলো এই পুঞ্জিভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটি এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের শুরু মাত্র। ..... দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনো দেখেনি বা শুনেনি।"

তিনি আরো লিখেছেন :

"চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সাথে সাথে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল, সেখানেই দিন-রাত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হলো এত শীঘ্র ও এতই বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ইংরেজ ভদ্রলোক এই ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ষাট হাজার পাউন্ড ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন।" [Young Husband : Transactions in India (1786) ; P. 123-24]

'মৃত্যু-ব্যবসায়ী' ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দালালদের সৃষ্ট এই ছিয়াত্তরের মহা-মন্বন্তর সম্পর্কে ইয়ং হাসবেন্ড মন্তব্য করেন :

"বাংলার সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নতুন অধ্যায়ের যোজনা করেছে, যা মানব সমাজের সমস্ত অস্তিত্বকালব্যাপী ব্যবসানীতির এই ক্রুর উদ্ভাবনা-শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে; অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকারসমূহের ওপর কত ব্যাপক, গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাচার চলতে পারে, এই অধ্যায়টি তারও কালজয়ী নির্দশন হয়ে থাকবে।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩১)

এ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার বিবরণ দিয়ে এল. এস. এস. ও মলী লিখেছেন :

"চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাদের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হলো। কিন্তু কে তাদের কিনবে? কে তাদের খাওয়াবে? বহু এলাকায় জীবিত লোকেরা মরা মানুষের গোশ্ত খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। নদী-তীর লাশ আর মুমূর্ষুদের দেহে ছেয়ে গিয়েছিল। মরার আগেই মুমূর্ষ লোকদের দেহের গোশ্ত শিয়াল-কুকুরে খেয়ে

ফেলত।" (L.S.S.O Molley : Bengal, Bihar and Orissa Under British Rule, P-113.)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে পরবর্তী যুগের ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> "১৭৬৯ সনের শীতকালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার জের দুই পুরুষ ধরে চলে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ইতিহাস ছিল চমকপ্রদ সামরিক-সাফল্যে প্রাণবন্ত কোম্পানির প্রশংসাপত্রসহ ধারাবাহিক সংগ্রামগুলোর সমাহার। সুতরাং যুদ্ধ বা সংসদীয় বিতর্কের সাথে সংযোগহীন এই ঘটনা (দুর্ভিক্ষ) সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই বললেই চলে।.... ১৭৭০ সনের সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে গণমড়ক অব্যাহত থাকে। কৃষকরা গবাদিপশু বিক্রি করে দেয়; বিক্রি করে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি; তারা বীজধান খেয়ে ফেলে; নিজেদের ছেলেমেয়েদের তারা বিক্রি করতে থাকে এবং তারপর তারও কোন ক্রেতা পাওয়া যায় না। তারা গাছের পাতা, ক্ষেতের ঘাস খেতে থাকে এবং ১৭৭০ সনের জুন মাসে দরবারের আবাসিক প্রতিনিধি শব ভক্ষণের সত্যতা সমর্থন করেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, রোগগ্রস্ত হতভাগ্যের দল দিবারাত্রি বড় বড় নগরগুলো পূর্ণ করতে থাকল। বছরের প্রথমে মহামারির প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। ... অর্ধমৃতদের সাথে শবদেহের অবিন্যস্ত স্তূপে পথ অবরুদ্ধ, নির্বিচারে কবর দিয়েও সমস্যার আশু সুরাহা হলো না; এমন কি প্রাচ্যের ঝাড়ুদার হিসেবে খ্যাত শিয়াল-কুকুরের দলও সাফাইয়ের বিতৃষ্ণাকর কাজে ব্যর্থ হলো এবং অবশেষে পচাগলা শবদেহগুলো নাগরিকের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলল। .... সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী ১৭৭০ সনের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয়। জুন মাসে মৃত্যু-সংখ্যা হিসেবে বলা হয় 'সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি ষোল জনে ছয় জন মৃত'; এবং হিসাব করে দেখা হয় যে, 'কৃষকসহ খাজনা প্রদানকারী জনসাধারণের অধিকাংশ ক্ষুধার জ্বালায় ধ্বংস হবে'। বর্ষাকালে (জুলাই হতে অক্টোবর) জনশূন্যতা এত প্রকট হয়ে উঠে যে, আতংকগ্রস্ত সরকার পরিচালক-সভার কাছে 'দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট কৃষক ও ক্ষুদে উৎপাদকদের (কারিগর) সংখ্যা 'সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে'।"
> [ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : গ্রাম বাংলার ইতিকথা (এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল গ্রন্থের অসীম চট্টোপাধ্যায় কৃত তরজমা), পৃষ্ঠা ১০-১৭]

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এই নযীরবিহীন গণমৃত্যু সম্পর্কে ইংরেজরা কতটা নিরুদ্বেগ ও বেপরোয়া ছিল তার বিবরণও হান্টারের লেখায় বিধৃত। ইংরেজরা তাদের লুণ্ঠনের পরিমাণ সম্পর্কেই আগ্রহী ছিল। এদেশের মানুষের ব্যাপারে তাদের জাতীয় মানসিকতা ছিল অদ্ভুত রকমের হৃদয়হীন নির্লিপ্তিতার।

হান্টার লিখেছেন :

> "১৭৭২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণ বাংলাকে একটা বিশাল গুদামখানা হিসেবে দেখত, যেখানে বেশ কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ মোটা লাভে এক বিশাল ব্যবসা চালাচ্ছে। বিপুল দেশীয় জনসংখ্যা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল ঠিকই, এটা যেন তারা একটা আকস্মিক পরিস্থিতি বলে বিবেচনা করত এবং বর্তমানে আমরা নাটাল বা প্রিয়েরীলিয়নের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে আগ্রহ বোধ করি, তার চেয়েও কম আগ্রহ তারা এ সম্বন্ধে বোধ করত।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭)

এ দেশের জনগণের ব্যাপারে ইংরেজদের মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে তাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা থেকে। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় :

> "বিশ হাজার লোক যে জেলায় প্রতি মাসে মারা যাচ্ছে, সে জেলার ত্রাণ-কার্যের জন্য কোম্পানি-সরকার একশত পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করে। চার লাখ উপবাসী মানুষের প্রতিদিনের সাহায্যের জন্য এক প্রাদেশিক পরিষদ 'গভীর বিবেচনার পর মহানুভবতার সাথে' দশ শিলিং মূল্যের চাউল অনুমোদন করেন। 'অর্ধেক কৃষক ও প্রজা উপবাসে মারা যাবে' এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও কোম্পানি কাউন্সিল তিন কোটি মানুষের ছয় মাসের নির্বাহের জন্য অনুদান ধার্য করেন চার হাজার পাউন্ড।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯)

এই অনুদান প্রকৃত ভুক্তভোগীর হাতে যায় কিনা, সে সম্পর্কেও হান্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন :

> "যে দেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণ কৃষিজীবী, সেখানে গণমৃত্যুর ফলে আনুপাতিক হারে জমি অনাবাদি থাকে। বাংলাদেশের জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশ মারা যায় এবং এক তৃতীয়াংশ আবাদি জমি দ্রুত পতিত জমিতে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর এত বেশি জমি অকর্ষিত থাকে যে, দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রজাদেরকে বাস্তুত্যাগ করে পরিষদশাসিত এলাকায় আনার জন্য (কোম্পানি সরকারের) পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী প্রথম পনের বছরে জনশূন্যতা অবিচলিতভাবে বাড়তে থাকে। ঘাটতির সময়ে সবচে বড় বিপর্যয়ের শিকার হয় শিশুরা এবং ১৭৮৫ সন পর্যন্ত বৃদ্ধরা মারা যায়। কিন্তু তাদের শূন্যস্থান পুরণের জন্য নতুন কোন প্রজন্ম ছিল না। জমি পতিত পড়েই রইল এবং তিন বৎসরের সতর্ক তদন্তের পর ১৭৮৯ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার কোম্পানির এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে বন্যজন্তু-আকীর্ণ জঙ্গল বলে ঘোষণা করেন।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩১)

সারা দেশে যখন মৃত্যুর এই বিভীষিকা চলছে, তখন ১৭৭২ সালে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তৎকালীন বাংলা ও বিহারের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেন :

"প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তার ফলে চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্বের চেয়ে বেশি হয়েছে। যে কোন লোকের পক্ষে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, এরূপ একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব তুলনামূলকভাবে কম আদায় হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।" (পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট)

এ প্রসঙ্গে হান্টার লিখেছেন :

"১৭৭২ সালে, পুরোনো চাষীরা মরীয়া হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিলে তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং বকেয়া খাজনার দায়ে কলকাতার 'ঋণগ্রস্তদের কারাগারে' তাদেরকে কয়েদ করা হয়। রাজস্ব নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে একই ঘটনা ঘটে। দুর্ভিক্ষের প্রায় ২০ বছর পর ব্রিটিশরা জেলার দায়িত্ব গ্রহণকালে জেলাগুলো বকেয়া খাজনাজনিত বন্দীতে পূর্ণ ছিল এবং কোনো বন্দীরই পুনঃমুক্তির কোনো আশা ছিল না। দেশ যখন প্রতিটি বছরের সাথে আরো অধঃপতিত হচ্ছে তখন ইংরেজ সরকার ক্রমাগত বর্ধিত খাজনা দাবি করতে থাকে। ১৭৭১ সনে আবাদি জমির এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি সরকারি হিসেবে পরিত্যক্ত বলে দেখানো হয়। ১৭৭৬ সনে এই হিসেবে সমগ্র আবাদি জমির অর্ধাংশেরও বেশি দাঁড়ায়, প্রতি সাত একর আবাদি জমির সাথে চার একর পতিত থাকে। অন্যদিকে কোম্পানির দাবি ১৭৭২ সনে ১০,০০,০০০ পাউন্ডের কম হতে বেড়ে ১৭৭৬ সনে প্রায় ১১,২০,০০০ পাউন্ডে দাঁড়ায়।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)

বাংলায় ইংরেজ বণিক শ্রেণী, আর তাদের লুণ্ঠন-সহচর বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজা, জগতশেঠ-আলম চাঁদ প্রমুখ কোটিপতি লগ্নি-পুজির মালিক, তাদের আত্মীয়-স্বজন, নব্য বিত্তশালী এজেন্ট, বেনিয়া, নিলামে জমিদারী খরিদকারী নতুন বর্ণহিন্দু শহুরে জমিদার শ্রেণী, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা তাদের দালাল, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি অর্থলগ্নীর দল তাদের গোলা, মড়াই, আড়ত, কাচারীতে সারা বাংলার খাদ্যশস্য মজুত রেখে যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। স্বল্পকালের লুণ্ঠন-শোষণের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। জগত শেঠ, আলম চাঁদ প্রমুখ কোটিপতিগোষ্ঠী এ সময় সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। কেউ প্রত্যক্ষ মজুতকারবারী, কেউ বেনামী অংশীদার, আর কেউ অর্থের লগ্নিকারী। ইংরেজ বণিকশ্রেণীর শাসনকালের ইতিহাসে এই সময়কাল নিষ্ঠুরতার বিচারে তুলনাহীন। ইংরেজ বণিকশ্রেণীর এই অদ্ভুত শাসনকে ইংল্যান্ডের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এডমন্ড বার্ক মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'মৃত্যুর শাসন' আর ওরাঙ ওটাঙ বা 'নেকড়ের শাসন' নামে অভিহিত করেছেন। (Speeches of Edmaund Burk)

কোম্পানি শাসনের এই ভয়াবহ রূপ দেখেই বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> "কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির একচেটিয়া শাসনই যেকোন দেশের বিভিন্ন প্রকার শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসন।" (Adam Smith : Essays on Political Economy, P-131)

সমসাময়িক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ সিয়ারুল মুতাআখখেরীন-প্রণেতা এই দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হয়ে লিখেছেন :

> "ইয়া আল্লাহ। তোমার দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বান্দাহদের সাহায্যের জন্য একবার তুমি নেমে আস। এই অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে তুমি তাদের উদ্ধার কর।" (গোলাম হুসাইন তাবাতাবাই : সিয়ারুল মুতাখখেরীন– গোলাম হুসাইন খান অনূদিত)

ভূমি-ব্যবস্থার ধ্বংস ও কৃষক শোষণের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'

ইংরেজ ও এদেশীয় জনশত্রুদের সৃষ্ট ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর বাংলা ও বিহারের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের শেষ চিহ্ন মুছে দিয়েছিল। ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞের এই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়েই ইংরেজ বণিক-শাসকরা তাদের কৃষক-শোষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের দ্বারা মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত ইজারা, জমিদারী, একে একে খসিয়ে ফেলে নতুন হিন্দু জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীর আমদানি করা হয়। যেসব হিন্দু কর আদায়কারী ঐ সময় পর্যন্ত নিম্ন পদের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয় (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান; এম, আনিসুজ্জামান অনূদিত পৃষ্ঠা ১৪১)। ফলে অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো একেবারে উৎখাত হয়।

হেস্টিংস-এর চুক্তি (১৭৭২-৯৩) ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে এদেশের বুনিয়াদি ও পুরনো জমিদারদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তন। নিলামের ডাকে যারা প্রচুর অর্থ দিতে পারতো, তাদেরকেই জমিদারী দেওয়া হতো। পুরনো জমিদারদের পক্ষে ইংরেজদের চাহিদা মাফিক অর্থ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রচুর জমানো টাকা নিয়ে এগিয়ে এল বেনিয়ান, গোমস্তা, মহাজন আর ব্যাংকের মালিকরা। লুণ্ঠন-শোষণের মাধ্যমে অর্জিত নগদ টাকার জোরে রাতারাতি তারা জমিদার হয়ে বসল। তাদের সকলেরই ধর্মীয় পরিচয় হিন্দু। তাদের গোত্রীয় পরিচয় দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিক, শীল, তিলি বা সাহা। তাদের অনেকেরই পূর্ব পরিচয় তারা পুরাতন জমিদারদের নায়েব কিংবা গোমস্তা। আর তাদের অভিন্ন পরিচয় তারা বাংলা নব্য-প্রভু শাসকদের দালালরূপী লুটেরা-শোষক।

মুসলমান জমিদারদের জমিদারী দখল এবং মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে ষড়যন্ত্রে মিলিত হয়। পাদ্রীদের পরামর্শে কোম্পানি সরকার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আয়মা লাখেরাজ ও তৌজী লাখেরাজের দলিল-দস্তাবেজ ও সনদ-পাঞ্জা কোম্পানি সরকারে দাখিল করার জন্য এক আকস্মিক নির্দেশ জারি করে। মুসলমানদের অনেকেই এসব দলিল-পত্র মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করতে পারল না। তাদের সমুদয় লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করা হয়। এছাড়া মুসলমানদের অধিকাংশ জমিদারী পাদ্রীদের সুপারিশে কোম্পানি সরকার খাস করে নেয় এবং পরে তা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের বন্দোবস্ত দেয়। (আবদুল গফুর সিদ্দিকী : শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা ৪৫)

সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে যে ভূমি-ব্যবস্থা ছিল, তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অনুস্বত্বের অধিকারী নতুন জমিদাররা জমির পূর্ণস্বত্ব মালিকানা লাভ করল। কৃষকরা হলো তাদের অনুগ্রহ ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল। কৃষকরা শুধু জমি চাষ করার অনুমতি লাভ করল। জমিতে তাদের কোন স্বত্ব রইল না। কৃষকের স্বত্ব এবং ভূমি-ব্যবস্থার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকল না। এ ব্যবস্থার ফলে উপস্বত্বের অধিকারীরা পূর্ণস্বত্ব ভোগের দ্বারা কৃষকদের ওপর যে নির্মম নিষ্পেষণ চালায় তার বিবরণ তুলে ধরে আবদুল মওদুদ উল্লেখ করেছেন :

> "এই নয়া ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অত্যাচার এতখানি চরমে উঠেছিল যে, দাড়ি রাখার জন্য নতুন ট্যাক্স বসাতে তাদের অনেকের সংকোচ হয়নি।" (আবদুল মওদুদ : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি; ড. হাসান জামান সম্পাদিত ও নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশিত, 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃষ্ঠা ৬১)

ইংরেজরা তাদের বর্ধিত রাজস্বের দাবি আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই জমিদারদের সাথে প্রথমে পাঁচসালা, এরপরে দশসালা ব্যবস্থা করে এবং ১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডের ভূমি-ব্যবস্থার অনুকরণে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নিজস্ব রাজস্ব দিয়ে যথেচ্ছা পরিমাণে খাজনা আদায় ও জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত ও উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। জমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করে তাদেরকে জমিদারী শোষণ-লুণ্ঠন ও নির্যাতনের স্থায়ী শিকারে পরিণত করা হয়।

মুসলিম শাসন আমলে বাংলার জমিদারদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। তারা ছিলেন বিভিন্নভাবে জমির অধিকারী এবং রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী সরকারি কর্মচারী মাত্র। নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করা এবং শাসন বিভাগের আংশিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত

ছিল। জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে পারতেন না; কিংবা কোনরূপ অত্যাচার করতে পারতেন না। রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে ফৌজদারগণ দায়িত্ব পালন করতেন। কোন কারণে জমিদাররা সরকারের অবাধ্য হলে বা জনসারণের প্রতি অত্যাচারী হলে তাদের জমিদারী ছিনিয়ে নেওয়া হতো। (মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)

ইংরেজ বণিক শাসনে এই পুরো ব্যবস্থারই খোল-নলচে পাল্টে ফেলা হয়।

> প্রথমত, মুসলিম আমলে ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায় করা হতো। এখন জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হলো।
>
> দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের নব-প্রবর্তিত ব্যবস্থায় জমির মালিকানার ওপর কৃষক বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধিকার রহিত হলো।
>
> তৃতীয়ত, কোম্পানি সরকার খাজনা আদায়ের জন্য জমির মালিকানা ইজারা দিল বিভিন্ন ভয়ালরূপী যোগানদারের কাছে। নিলামের ডাকে প্রচুর অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়ে পুরনো জমিদাররা পিছিয়ে গেল। সেখানে ইংরেজদের লুণ্ঠনবৃত্তির এদেশীয় সহচর এমন একটি নব্য পুঁজিপতি শ্রেণী অধিষ্ঠিত হলো, যাদের একমাত্র ঐতিহ্য ছিল ইংরেজদের তোষণের জোরে এদেশের কৃষকদেরকে লুণ্ঠন করা। এই শ্রেণীর জমিদাররা সকলেই হিন্দু আর তাদের রায়তরা শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও বেশি মুসলমান। তারা জমির স্বত্ব হারিয়ে নবোত্থিত বর্ণহিন্দু লুটেরা জমিদারদের স্থায়ী শোষণ ও জুলুম-নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ ইংরেজদের বিভিন্ন পদক্ষেপকে 'শঠতা' বলে উল্লেখ করে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন :

> "বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীর বাদশাহর প্রধান রাজস্ব অফিসারের দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে। মোটা অংকের উৎকোচ দেওয়ার পরিবর্তে তলোয়ারের জোরেই এই নিয়োগ আমরা ক্রয় করেছি। কিন্তু আমাদের পদের নাম ছিল বাদশাহের দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব অফিসার। এ কারণে মুসলমানরা মনে করে যে, মুসলমানের প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে আমরা বাধ্য; কারণ ঐ বিধি-ব্যবস্থা প্রশাসনের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে এ সম্পর্কে সংশয়ের খুব কমই অবকাশ আছে যে, চুক্তি রচনার সময় উভয় পক্ষ এটাই বুঝেছি.......। পুরনো ব্যবস্থার ওপর যে প্রচণ্ড আঘাত আমরা হেনেছি সেটা বোধ করি শঠতার পর্যায়েই পড়ে এবং ইংরেজরা বা মুসলমানরা

কেউই এর পরিণতি উপলব্ধি করতে পারেননি। এটা হচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং জন শোর প্রবর্তিত এক গাদা সংস্কার কার্যক্রম, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।" (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমনাস, পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০)

কোম্পানির সমর্থকরূপে নব্য জমিদার ও মহাজন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় যে শোষণ-ব্যবস্থা চালু হয় সে সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

"বাংলাদেশের জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে। তখন হইতে জমিদারগোষ্ঠীর আদায় ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু শাসকদের রাজস্ব অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের লুণ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগ দিয়া এদেশে জমিদার নামক একদল স্থায়ী শাসককে তাহাদের রক্তাক্ত শাসন ও শোষণে চিরস্থায়ী সমর্থগোষ্ঠীরূপে সৃষ্টি করে।" (সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৬)

ইংরেজ শাসক ও তাদের সমর্থক জমিদারদের খাজনার দাবি মিটাতে কৃষকরা তাদের জমি ও বাড়িঘর বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের জন্য মহাজনদের শরণাপন্ন হয়। সুদে-আসলে সে ঋণ পরিশোধ করতে কৃষকরা ব্যর্থ হয়, আর মহাজনরা তাদের ঘরবাড়ি জমি-জিরাত কেড়ে নেয়। এভাবে মহাজনরা কালক্রমে জমিদার হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের শোষণের যোগ্য অংশীদারে পরিণত হয়। বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহাজন মাত্রই হিন্দু। ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট এসব জমিদার-মহাজনরাই ছিল বাংলাদেশের নিরীহ সরল কৃষকদের প্রধান শত্রু।

ঋণদান ছাড়া মহাজনদের অন্য একটি ভূমিকা ছিল। ফসল বিক্রি করতে হলে চাষীকে সেই মহাজনের কাছেই ধর্ণা দিতে হতো। ঋণ ও সুদের দাবি মিটাতে চাষীকে মহাজনের শোষণের স্থায়ী শিকার হয়ে থাকতে হতো। মহাজনের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় ছিল না। কখনো ক্ষেপে গিয়ে চাষীরা যাতে মহাজনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চালাতে না পারে, সে জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সর্বশক্তি দিয়ে মহাজনশ্রেণীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়। এভাবে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের কৃষকদের ওপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক-শক্তি তাদের সমস্ত ভার নিয়ে চেপে বসে। বৃটিশরা আদায় করে তাদের ভূমিরাজস্ব। এই ভূমিরাজস্বের ওপর বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন নামের জমিদার আদায় করে তাদের খাজনা ও বিভিন্ন কর। আর মহাজনরা কৃষকের বাকি ফসলের প্রায় সবটুকু কেড়ে নেয় তাদের ঋণের সুদ হিসেবে।

এ প্রসঙ্গে আর পি দত্ত উল্লেখ করেছেন :

"বৃটিশ-ভারতের একজন কৃষকের বার্ষিক গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮ থেকে ৪২ টাকা। ট্যাক্স-খাজনা এবং মহাজনের ঋণ বা ঋণের সুদ পরিশোধ করার পর কৃষকের হাতে অবশিষ্ট থাকত মাত্র ১৩ থেকে ১৭ টাকা। অর্থাৎ আয়ের এক তৃতীয়াংশ হাতে নিয়ে কৃষকের সারা বছর কিভাবে চলবে সেই সমস্যার কথা ভাবতে হতো।" (আর পি দত্ত : ইন্ডিয়া টু-ডে, পৃষ্ঠা ২৫১)

বাংলাদেশের লুটের টাকায় বিলাতে শিল্প-বিপ্লব

কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটল। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো ধ্বংসের বিভীষিকা। মোগল আমলের বাংলার সমৃদ্ধ সমাজ-কাঠামো ধ্বংস হলো এবং কোম্পানির অনুগ্রহপুষ্ট দালাল, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, নব জমিদার ও মহাজন নামক লুণ্ঠনকারীরা সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। ইংরেজ বেনিয়াদের এ সকল ভাগ্যান্বেষী অনুচর, দালাল ও মোসাহেবদের দস্যুবৃত্তির দৌরাত্ম্যে দেশ জুড়ে ঘনিয়ে আসে শিল্পের ঘোরতর দুর্দিন।

এই নব্য লুটেরা শোষক শ্রেণীটি সত্যিকার জমিদার যেমন হতে পারেনি, ব্যবসায়ী হিসেবেও তারা ছিল দালাল-পর্যায়ভুক্ত। কোম্পানির একাধিপত্যের দরুন তারা বহির্বাণিজ্যে যেমন নাক গলাতে পারেনি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় বড় দিকও তেমনি ইংরেজদের একচেটিয়া দখলে চলে গিয়েছিল। ফলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল বিদেশীদের হাতে।

বাঙালি নব্য জমিদারগোষ্ঠী কৃষি ধ্বংস করল, কৃষকের সর্বনাশ ঘটালো, ব্যবসা হারাল, শিল্পকে অবহেলা করল, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প কেড়ে বাড়ি-ঘর ও জমি-জমায় টাকা খাটাবার দিকে মন দিল। ফলে সমৃদ্ধ একটি জাতি সব দিক দিয়ে রিক্ত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়ল। তাদের অগ্রগতির সকল দুয়ার রুদ্ধ হলো।

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলা ও বিহারের সম্পদ লুট করে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ বিলাতে নিয়ে যায় তার ফলে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিল্পব আরো আগে শুরু হলেও ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এর গতি ছিল মন্থর। কিন্তু বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ ইংল্যান্ডে পৌছতে শুরু করার পর থেকে সেখানে অতি দ্রুত বিভিন্ন কল- কারখানা গড়ে উঠতে থাকে।" (সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ ছিল একচেটিয়া রফতানিকারী দেশ। এদেশের পণ্য-সম্ভার দিয়েই ইংল্যান্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য এনে এদেশে বিক্রি করার কথা কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেনি।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার মতো উন্নত বস্ত্রশিল্প তখনো ইউরোপের কোন দেশে গড়ে ওঠেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয় ছিল, তার বিবরণ দিয়ে ব্রুকস এডামস লিখেছেন :

> "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হওয়ার ৫০ বছর পরও ব্যাংকের প্রচলিত নোটের মধ্যে সবচে বড় নোট ছিল ২০ পাউন্ডের নোট। ১৭৫০ সাল..... সমগ্র প্রদেশে বারোটার বেশি ব্যাংক ছিল না। অথচ ১৭৯০ সাল নাগাদ শহরের প্রতিটি বাজারে ব্যাংক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ থেকে রূপা আসার সাথে সাথে শুধুমাত্র অর্থের প্রচলন বেড়ে যায়নি, আন্দোলনও জোরদার হয়েছে।" (Brooks Adams : The Law of Civilization and decay; P. 203-4)

ব্রুকস এডামস শিল্প-বিপ্লবের পটভূমি তুলে ধরে লিখেছেন :

> "পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের লুণ্ঠিত ধন-রত্ন ইংল্যান্ডে আসতে লাগল। তখনই অবিলম্বে এর ফল বুঝা গেল। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। তারপর থেকেই (ইংল্যান্ডে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তার তুলনা বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ১৭৬০ সালের আগে ল্যাংকাশায়ারে বস্ত্র-শিল্পের যন্ত্রপাতি এদেশের মতোই সহজ সাধারণ ছিল এবং ১৭৯০ সালে ইংল্যান্ডে লৌহ-শিল্পের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। ..... ইংল্যান্ডে ভারতের ধন-সম্পদ পৌঁছার এবং ঋণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক শক্তি বা মূলধন ইংল্যান্ডের ছিল না।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০)

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের দরুন দেশীয় কারিগর ও শিল্পের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। বিলাতের শিল্প-বিপ্লব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দরুন কোম্পানি-রাজের বদৌলতে বিলাতি বস্ত্র ও শিল্প-সম্ভারে দেশ ছেয়ে যায়। বেনিয়ারা কারিগর শ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ফলে যারা ছিল শ্রমিক, তারাও জীবিকার একমাত্র পথ হিসেবে ভূমিচাষে এগিয়ে আসে।

ব্যবসাক্ষেত্রে বেনিয়া কুঠিগুলোকে কেন্দ্র করে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সি ও দেওয়ান নামে এক নতুন দালালশ্রেণী গড়ে ওঠে। এই শ্রেণীটিও দেশীয় শিল্প ও কারিগরকে গলাটিপে মারার পথ প্রশস্ত করে।

নতুন আর্থিক বিন্যাসের ফলে যে ভূস্বামী ও দালাল-শ্রেণীর উদ্ভব হলো তারা একজনও মুসলমান নয়, মুসলমানদের সে সমাজে প্রবেশাধিকার ছিল না। (আবদুল মওদুদ : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২)

এ শ্রেণীটিই পরবর্তীকালে গণবিক্ষোভ ও জাতীয় জাগরণের প্রধান শত্রু হিসেবে নিজ স্বার্থে সর্বদাই বৃটিশ শাসন টিকিয়ে রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এ দালাল-শ্রেণীটির ভূমিকার কথা উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও স্বীকার করেছেন। (A. B. Keiths : Speeches and Documents on Indian Policy Vol-1. p-2)

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের কল-কারখানার জন্য কাঁচামালের চাহিদা দেখা দেয়। সে ব্যাপারেও ইংরেজদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রতি। অন্যদিকে তাদের কল-কারখানায় তৈরি পণ্য-সামগ্রী এদেশের বাজার ছেয়ে ফেলে। এভাবে বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ মূলধনী শ্রেণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিরাট বাজার ও কাঁচামালের অফুরান ভাণ্ডারে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাচীন শিল্পব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের ওপর তাদের আঘাত সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর হয়েছিল। বাংলাদেশ তথা ভারতের বস্ত্র উৎপাদনকারী কারিগররা কোম্পানির বণিকদের দ্বারা পূর্বেই প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকরা তাদের কাছ থেকে বাজারদরের অর্ধেক দামে 'মসলিন' ও 'কেলিকো' কিনতো। পূর্বের সকল অত্যাচার ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গ্রাস থেকে তাঁতীদের যে একটি অংশ কোন প্রকারে বেঁচেছিল, বিলাতি পণ্যের বাজারে পরিণত হওয়ার ফলে সে উৎপাদক শ্রেণীটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিল, ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে সে শিল্প এই পর্যায়ে বিলুপ্ত হলো। ইংরেজ বণিক-শাসকদের হাতে এদেশের শিল্প ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছেন :

> "অনধিকার প্রবেশকারী ইংরেজরাই ভারতের তথা বাংলাদেশের তাঁত ও তকলী ভেঙ্গে চুরমার করে। ইংল্যান্ড ভারতের তুলাজাত দ্রব্য ইউরোপের বাজার থেকে বিতাড়িত করতে থাকে, তারপর হিন্দুস্থানকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। যে দেশ তুলার জন্মস্থান বলে চির পরিচিত, সে দেশটাকেই তারা শেষ পর্যন্ত তুলা দিয়ে (অর্থাৎ তুলাজাত দ্রব্য দিয়ে) ছেয়ে ফেলে।" (Karl Marx : British Rule in India)

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয় ও হিন্দু-উত্থান

ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পিছিয়ে পড়েছিল। সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনে এদেশে শিক্ষার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধুলিসাৎ হয়েছিল। ইংরেজরা শাসনভার গ্রহণ করার পর মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলো হল :

ক. ইংরেজ ও তার এদেশীয় সহচরদের সম্মিলিত লুণ্ঠন-শোষণের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থা;

খ. ওয়াক্‌ফ বা লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফত করার ফলে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়া;

গ. ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-প্রথার প্রবর্তন;

ঘ. নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অভাব;

ঙ. খ্রিস্টান মিশনারীদের পরামর্শ ও নির্দেশনায় ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণের ফলে ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা;

চ. মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা;

ছ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম হিন্দুয়ানী ভাবধারায় ঢেলে সাজানো;

জ. মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি সাহায্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়া; এবং

ঝ. পলাশীর বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানদের আহত আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তাদের ঐতিহ্যবিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বৈরী পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে না পারা।

মুসলিম শাসনামল থেকেই মুসলমানরা বাদশাহ, সুলতান, নওয়াব ও তাদের বড় কর্মচারীদের প্রদত্ত জায়গীর, আয়মা, আল তমগা, মদদ মাশ প্রভৃতি লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। এসব সম্পত্তির আয় দ্বারা শুধু তাদের ভরণ-পোষণই চলত না, অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ইমামবাড়া, মুসাফির-খানাসহ নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সময় বাংলার এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তি ছিল নিষ্কর। ইংরেজরা ১৮২৮ সালে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াফত আইন পাস করে এসব নিষ্কর সম্পত্তি কেড়ে নেয়। শুধু বাংলাদেশেই ১৮২৮ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত কয়েক বছরে অন্তত কুড়ি হাজার নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াফত হয়। ফলে বহু প্রাচীন মুসলিম বংশ উৎখাত হয় এবং মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহসহ অসংখ্য মুসলিম শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয়।

ম্যাক্সমুলার উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজদের ক্ষমতা দখলকালে বাংলায় আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। প্রতি চারশ' লোকের জন্য তখন একটি মাদরাসা ছিল। বখতিয়ার খিলজী থেকে আলীবার্দী খান পর্যন্ত বিদ্যোৎসাহী মুসলিম শাসকদের আমলে এদেশে অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দরসবাড়ী, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাঁও, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বহু বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। উপমহাদেশের বাইরে থেকেও উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু ছাত্র বাংলার এসব শিক্ষাকেন্দ্রে জমায়েত হতেন।

ইংরেজদের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়। ইসলামী শিক্ষার মহতী কেন্দ্ররূপে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার

অবসান ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত কেন্দ্রগুলোর সন্ধান লাভও এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারীদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ-সাহায্যে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। (R. C. Majumder : Bengal in the Nineteenth Century, P-32)।

লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলের পরামর্শে সৃষ্ট ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত আইনবলে কেবলমাত্র ইংরেজি স্কুল ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য লাভের অনুপযুক্ত ঘোষিত হয়। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহ্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এ সম্পর্কে মেকলের উক্তি থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

> "বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে; কিন্তু রুচি, মতামত ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।"
> (Woodrow : Macaulay's Minutes on Education in India [1862])

এই মেকলের মেজাজ ও মানসিকতা সম্পর্কে তার আর একটি দম্ভোক্তি থেকে জানা যায়। তিনি একবার বলেছিলেন :

"ইউরোপীয় যে কোনও ভালো লাইব্রেরির একখানি মাত্র আলমারী ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের চেয়েও বেশি মূল্যবান।"

১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করা হয়। ফলে মুসলমানদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, ইংরেজিতে ডিগ্রীপ্রাপ্তরাই সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। ইংরেজদের এই সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তগুলো মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর একের পর এক আঘাত হানে।

১৮১৪ সালে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষাখাতে তারা বার্ষিক এক লাখ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে। অথচ অন্যদিকে ১৮১৬ সালে তারা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ওয়াকফ তহবিলের সাড়ে বাইশ লাখ টাকা হস্তগত করে।

মুসলমানরা ৫৫,০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের সাড়ে বাইশ লাখ টাকার তাদের এই নিজস্ব তহবিল থেকে নিজেরাই যদি ব্যয় করতে পারত, তবে সরকারি সাহায্যের কপর্দকমাত্র ছাড়াই তারা সারা দেশে নিজেদের শিক্ষার অনেকাংশের ব্যয়-সংকুলান করতে পারত।

কিন্তু ইংরেজ সরকার ধর্মীয় ও ওয়াকফ সম্পত্তির এই বিপুল অর্থ ১৮১৬ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে অমুসলমানদের জন্য ব্যয় করে। (নওয়াব আবদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহসিন ফান্ডের টাকা নির্ধারিত মুসলিম শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয় হবে।)

মুহসিন ফান্ডের সে বিরাট আয় থেকে ১৮৩৬ সালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজ খোলা হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে কোন মুসলমান ছাত্র ভর্তির সুযোগ ছিল না। অথচ হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) দানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজে হিন্দুদের পড়ার সুযোগ থাকে অবারিত। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৩০০ ছাত্রের মধ্যে বছরের পর বছর সেখানে এক ভাগও মুসলমান ছিল না।

চট্টগ্রামে মীর ইয়াহিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যে বিপুল সম্পত্তি রেখে যান, কোম্পানি সরকার সে দানের টাকায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। সে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু।

নতুন গজিয়ে ওঠা হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণী শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার নযীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইংরেজদের লুণ্ঠন-সহচর এই জমিদার ও ধনিক গোষ্ঠী শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়েছে নিজেদের মুসলিম-প্রধান জমিদারী এলাকায়। কিন্তু মুসলিম রায়ত-প্রজাদের কাছ থেকে লুটে নেওয়া ধন-সম্পদ থেকে স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য ব্যয় করেছে হিন্দু-প্রধান অন্য এলাকায়। নোয়াখালীর জমিদার প্রতাপচন্দ্র কিংবা জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবার, সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অভিন্ন ছিল। প্রতাপচন্দ্র মুসলিম প্রধান নিজ জমিদারী এলাকার শিক্ষার জন্য কোন কিছু না করে স্কুল কায়েম করেছেন বীরভূমে হিন্দু প্রধান এলাকায়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকায়; কিন্তু তারা থেকেছেন কলকাতায় এবং জমিদারীর আয় থেকে খরচ যা কিছু করেছেন সেখানেই।

খ্রিস্টান মিশনারী ও নব্য-পুঁজিপতি দালাল হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষা শিক্ষার স্কুল বাংলা পাঠশালাগুলোতে 'বাংলা ভাষা'র নামে যা শিখানো হতো তা আসলে সংস্কৃতেরই নামান্তর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা যবানকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পাঠ্য-পুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল হিন্দু দেব-দেবীর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। ছাত্রদের জন্য ক্লাসে সরস্বতী-বন্দনা ছিল বাধ্যতামূলক।

১৮৪১ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৪৬ সালে ঢাকার স্কুল-কলেজে ২৬৩ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১৮ জন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মাত্র চার দশকের মধ্যে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ গুণ। এই ছাত্রদের প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। ১৮৮১ সালে ১৭১২ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ১৪৮০ জনই ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু। বাকিরা বিহারি, অসমীয়া বা

উড়িয়া। বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। একই বছর গোটা উপমহাদেশে ৪২৩ জন এম এ ডিগ্রী লাভ করে। তার মধ্যে ৩৪০ জন ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু। ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের ছাত্রদের সম্মিলিত সংখ্যা মাত্র ৮৩ জন। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের এই উত্থান যে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদের ফল, তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

ইংরেজদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন :

> "আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থি, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। .... আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি।" (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৬০)

মুসলমানদের সর্বনাশের এ নাটকে ইংরেজ নায়কের পাশে ভিলেনরূপী বর্ণহিন্দুদের উত্থান ও জাগরণ সম্পর্কে সুরজিত দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো, অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিতশ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।" (সুরজিত দাশ গুপ্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম; পৃষ্ঠা ১৬৯)

সুরজিত দাশগুপ্ত লিখেছেন :

> "ব্রিটিশদের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকার দেশীয় মানুষ সামর্থ্য ও সাহায্য যুগিয়েছে : পাইক সম্প্রদায়– এরা ব্রিটিশদের বাহুবল যুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়.... এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র বা দালাল হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে, ধর্মের বিচারে ব্রিটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।"

এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন : প্রথম যুগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছে, যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের চাকরিও পেয়েছে। মুসলমানরা সে রকম সুযোগ-উৎসাহ পাননি।

সরকারি চাকরি : 'মুসলমানদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই'

মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় চাকরির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। রাজস্ব আদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সকল উল্লেখযোগ্য উচ্চপদে মুসলমানরাই নিযুক্ত ছিল। দেওয়ান পদে সব সময়ই মুসলমান কর্মচারি ছিল এবং প্রাদেশিক দেওয়ান অফিসে বহুসংখ্যক মুসলমান কর্মচারী কাজ করত। বাংলাদেশের ১৬৬০টি পরগনায় আমিন, আলিম, কারকুন, খাজাঞ্চি, কানুনগো প্রভৃতি পদে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী কাজ করত। ছোটখাট পদে ছিল হিন্দুরা। বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাযী, মুফতী, মীর-ই-আদল প্রভৃতি পদে মুসলমানরাই অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এভাবে বিভিন্ন সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে যেসব মুসলমান কর্মরত ছিলেন, ইংরেজ আমলে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়। পলাশীর পতনের পরপরই কোম্পানির নির্দেশে মীর জাফর আশি হাজার দেশীয় সৈন্যকে বরখাস্ত করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় বাকি সৈন্যদেরও চাকরিচ্যুত করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক সকল কর্মস্থল থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়। মুসলমানদের চাকরিচ্যুত করে বিভিন্ন সরকারি পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হয়।

ইংরেজদের নিয়োগ-নীতির বদৌলতে সৃষ্ট অবস্থা সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন :

> 'একশত বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয় চাকরির সমস্ত পদ মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। বর্তমানে তাদের আনুপাতিক হার মোট সংখ্যার তেইশ ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। এটাও আবার শুধু মাত্র গেজেটেড চাকরির বেলায় প্রযোজ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেছে। ক'দিন আগে দেখা যায় যে, কোন একটা বিভাগে এমন একজনও কর্মচারী নেই, যে মুসলমানের ভাষা পড়তে জানে; এবং বস্তুত কলিকাতায় এখন কদাচিত এমন একটা সরকারি অফিস চোখে পড়বে, যেখানে চাপরাশি ও পিয়ন পদের উপরিস্তরে একজনও মুসলমান কর্মচারী বহাল আছে। এ রকম হওয়ার কারণ কি এই যে, মুসলমানদের চাইতে হিন্দুরা অধিকতর যোগ্য এবং তারাই সুবিচার পাওয়ার দাবি রাখে? অথবা ব্যাপারটা কি এই যে, বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের এত বেশি সুযোগ রয়েছে যে, সরকারি চাকরি গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক এবং তাই চাকরির জায়গাটা তারা হিন্দুদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, কিন্তু সরকারি কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্য যে রকমের সর্বজনীন ও অনন্য মেধা থাকা দরকার, বর্তমানে তা তাদের নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও এ কথার পরিপন্থী। বাস্তব

সত্য হলো এই যে, এদেশের শাসন-কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয়, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য এখন সরকারি চাকরি এবং বেসরকারি কর্মক্ষেত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮)

১৮৬৯ সালের আইন-আদালতের চিত্র তুলে ধরে হান্টার লিখেছেন :

"মহামান্য রাণীর নিযুক্ত মোট ছয়জন আইন অফিসারের মধ্যে চারজন ইংরেজ ও দুই জন হিন্দু ছিল, মুসলমান একজনও ছিল না। হাইকোর্টের উচ্চতর গেজেটেড পদে মোট একুশ জন অফিসারের মধ্যে সাতজন ছিল হিন্দু, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। ব্যারিস্টারদের মধ্যে তিনজন ছিল হিন্দু, মুসলমান একজনও ছিল না। কিন্তু হাইকোর্টের উকিলের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকাটা সর্বাধিক করুণ ইতিহাসের পরিচায়ক। বর্তমানে যারা জীবিত, তাদের সকলেরই মনে আছে যে, আইনের এই পেশাটা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদেরই করায়ত্ত ছিল। ...... ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে উকিল হিসেবে সনদ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের সবাই মুসলমান। এমনকি, ১৮৫১ সালেও যারা সনদ পেয়েছে তাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান। এরপর থেকেই এ পেশায় নতুন ধরনের লোকদের সমাগম ঘটতে থাকে। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ্যতার যাচাই শুরু হয়ে যায় এবং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত মোট সনদপ্রাপ্ত দু'শ চল্লিশজন ভারতীয়ের মধ্যে দু'শ উনচল্লিশ জনই হিন্দু, আর মুসলমান মাত্র একজন। ...... হাইকোর্টের এটর্নী, প্রক্টর ও সলিসিটর পদে ১৮৬৯ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল সাতাশ, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। শিক্ষানবীশ হিসেবে কর্মরত উদীয়মান আইনজীবীদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ, কিন্তু মুসলমান শূন্যের কোঠায়।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০)

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে।

১৮৬৯ সাল ও তার পরবর্তী বছরগুলোর অবস্থার পর্যালোচনায় দেখা যায়, চাকরির সর্বোচ্চ স্তরে আনুপাতিক হার ছিল মুসলমান একজন আর হিন্দু দু'জন। এরপর মুসলমান একজন, হিন্দু তিনজন।

দ্বিতীয় স্তরে আগে ছিল মুসলমান দুই আর হিন্দু নয় জন, পরে মুসলমান এক আর হিন্দু দশজন।

তৃতীয় স্তরের চাকরিতে পূর্বে মুসলমান চারজন আর হিন্দু ও ইংরেজ মিলে সাতাশ জন, পরে মুসলমান তিন এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে চব্বিশ জন।

নিম্ন স্তরে ১৮৬৯ সালে মুসলমান ছিল চার জন ও অন্যান্য ত্রিশ জন। পরে মুসলমান চারজন আর অন্যান্য ঊনচল্লিশ জন।

শিক্ষানবীশ স্তরে ১৮৬৯ সালে আটাশ জনের মধ্যে দু'জন মুসলমান আর পরবর্তীকালে সেখানে একজনও মুসলমান নাই।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬)

কলকাতা থেকে ফারসি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'দূরবীন' ১৮৬৯ সালের জুলাই সংখ্যায় চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন :

> "উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সকল চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। অথচ এমন সময় এসেছে, যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারি চাকরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না। কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাঙক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চাকরিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসারটি সরকারি গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, তাতে বলা হয় যে, এই শূন্যপদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে। মোট কথা হল, মুসলমানদের এতোটা নীচে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হাসিল করা সত্ত্বেও সরকারি বিজ্ঞপ্তি মারফত এটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য কোন চাকরি খালি নেই। তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি কারো দৃষ্টি নেই এবং এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও রাজি নয়।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩)

চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের ওপর সবচে বড় আঘাতটি করা হয়েছিল অফিস-আদালতের ভাষারূপে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু করার মাধ্যমে। এই কাজে ইংরেজদের উদ্বুদ্ধ করতে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ সরকারের সমর্থক ইংরেজি শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের উচ্ছেদ করে একচেটিয়া অধিকার লাভের স্বার্থ-চিন্তাকে সামনে রেখে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিস আদালতের ভাষারূপে চালু করার জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং আরো বিভিন্নভাবে দাবি জানাতে থাকে।

দিল্লী সম্রাটের কাছ থেকে রাজা উপাধি নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে রাম মোহন রায় ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালুর পক্ষে ওকালতি করে আসেন। ইংরেজরা এই দাবি নিজেদের জন্যও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থানুকূল বিবেচনা করে ১৮৩৭ সালে এক আকস্মিক আদেশ জারির মাধ্যমে ইংরেজিকে অফিস-আদালতের ভাষারূপে ঘোষণা দেয়। এর ফলে সরকারি চাকরির প্রতিটি দুয়ার মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন ফারসি সরকারি ভাষারূপে চালু থাকার কারণে এবং ইংরেজদের শিক্ষানীতি সকল দিক দিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ, সামর্থ্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আঘাতরূপে বিবেচনা করার কারণেই মুসলমানরা এতকাল ইংরেজি শিক্ষা করেননি এবং তা করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও অনুভব করেনি। জেমস লঙ মুসলমানদের ইংরেজি না শিখার একটি কারণ হিসেবে বলেছেন :

> "খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবী ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দু'টি ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল।" (বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ১৫৬)

মুসলমানদের ইংরেজি না শেখার পটভূমি তুলে ধরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ ১৮৮০ সালে 'দি ফিউচার অব দি মোহামেডানস অব বেঙ্গল' নামক পুস্তিকায় 'সাঈদ' ছদ্মনামে লিখেছেন :

> "The Aversion to English education is traceable to pride of race not felt by the Hindus, to their possession of a rich literature of their own, to their greater religious bigotry and partly to their poverty." (The Calcutta, Review, Vol LXXII. NO; CX LIV, 1881. P-V; ডক্টর ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃষ্ঠা ৫৯)

মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ না করার একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ইংরেজ ও তাদের সহযোগী দালাল হিন্দু জমিদারদের শাসন-শোষণে মুসলিম অভিজাতশ্রেণী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানের পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। শহরের ব্যয়বহুল শিক্ষার জন্য সন্তানদের প্রেরণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে সিসিল বিডন ১৮৫২ সালের ২৫ এপ্রিলের এক 'মন্তব্যপত্রে' লিখেছেন :

> "মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, তারা তাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থ দৈন্য ছিল না।" (ডক্টর ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃষ্ঠা ৫৯)

সার্বিক এ বৈরী পরিস্থিতিতে চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে অবস্থা দাঁড়ায়, সে সম্পর্কে হান্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার ১৮৭১ সালে প্রদত্ত একটি তালিকা থেকে জানা যায়, সে সময়কার ২১১১টি গেজেটেড পদে মুসলমান ছিল মাত্র ৯২ জন। আর ১৫টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ আটটিতে একজনও মুসলমান ছিল না। (হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭)

চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের অপসারিত করে হিন্দুদেরকে অধিষ্ঠিত করার পিছনে ইংরেজদের যে মানসিকতা কাজ করেছে, ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে স্যার জন ম্যালকম-এর বক্তৃতা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন :

"ভারতের হিন্দুদের সহযোগিতাই আমাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়।"

লর্ড এডিনবরো একইভাবে সে মানসিকতা তুলে ধরেছেন। তিনি ১৮৪৩ সালে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে এক পত্রে লিখেছেন :

"মুসলমানরা বরাবরই আমাদের শত্রু। ভারতে আমাদের নীতি হবে হিন্দুদের প্রতি আমাদের হস্ত প্রসারিত রাখা।" (A. R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal. P-64)

ভাষা ও সাহিত্য : মুসলিম সৃষ্টিধারায় বিপর্যয়

ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলিম শাসক, প্রচারক ও লেখকদের অবদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে বাংলাকে যেমনি মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তেমনি তাদের হাতেই মৃত ও অবহেলিত বাংলা ভাষা নবজীবন পেয়েছে। এমনকি বাংলা গদ্যের যে নমুনা, তাও মুসলিম শাসনামল থেকেই পাওয়া যায়। ষোল শতাব্দীর আগেই চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজনে গদ্যের খানিকটা প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনকালে সাহিত্যের প্রয়োজন ছাড়াও সরকারি দফতরখানা, খাজাঞ্চিখানা, কাজীর বিচারালয় ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। সেই গদ্যের পরিচয় জানিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন :

"ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলা গদ্যে লেখা চিঠির নমুনা পাওয়া যাইতেছে। দলিল পাইতেছি সপ্তদশ শতাব্দী হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা চিঠি ও দলিল অনেকগুলিই মিলিয়াছে। এই সময়ে লেখা দলিল এবং কাজ-কর্মের চিঠিতে আরবী-ফারসি শব্দের বড়ই আতিশয্য। এমনকি ভাষা ঠিক বাংলা বলতে বাধে।" (ডক্টর সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে গদ্য; মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : মুসলিম সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪)

সুকুমার সেন বা পরবর্তীকালের বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে বাংলা ভাষার আদি গদ্য-রূপটি 'বাংলা বলতে বাধলে'ও এটাই ছিল বাংলা ভাষার আদি অবস্থা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য– নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, দৌলত কাজী, ভারতচন্দ্র, সৈয়দ আলাউল, শ্রীকর নন্দী, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছটি খাঁ, আবদুল গফুর, ফয়জুল্লাহ, মুন্সী মুহাম্মদ আবেদ আলী, মুন্সী আইজুদ্দীন, মুন্সী আসমত– প্রমুখের লেখায়ও আরবী-ফারসিবহুল বাংলা ভাষাই লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন সম্পর্কে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন :

> "বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনে আরবী-ফারসি শব্দের অকুণ্ঠিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির পত্রে এবং পরবর্তীকালে পাদ্রী জেকব বিশ্বাসের গদ্য রচনায় এই রূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষার সহিত পুঁথির ভাষার পার্থক্য খুব বেশি নহে। অতএব, আরবী-ফারসিবহুল বাংলা যে কেবল অশিক্ষিত মুসলমান শায়েরদের রচনায়ই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে– তাহা আরও অধিক বিস্তৃত ও তাহার মূল আরও গভীরে প্রোথিত ছিল।" (আবদুল গফুর সিদ্দিকী : মাহে নও, কার্তিক, ১৩৬৩)

পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের ব্যাপারে ইংরেজরা যে নীতি গ্রহণ করে, তার ফলে মুসলিম অভিজাতশ্রেণী বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষমতা হারায়। ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যে নতুন ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে তাতে বাংলা ভাষার চেহারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং ইংরেজ-প্রসাদপুষ্ট ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার রূপ ও সাহিত্যের গতি পাল্টাতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের এবং ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের এমন এক প্রেরণা যুক্ত হয়েছিল, যার সাথে বিপর্যস্ত মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিনষ্ট হলো। নতুন যে সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্মিত হলো, সে সাহিত্য হিন্দুর। হিন্দু সাহিত্য, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুর সমাজাদর্শই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সবটুকু জায়গা জুড়ে ঠাঁই করে নিল। ভাষার সংস্কারে এবং বাংলা গদ্য-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টানরা এ সময় ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছিল। তার পিছনে কাজ করেছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুবিধা সৃষ্টির প্রেরণা। বর্ণ হিন্দুরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার কারণেই ছাপাখানার ব্যবহার ও বিপুল সংখ্যক বইপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাষার গতি পাল্টে দেওয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা ভাষার আদল পরিবর্তনের এ কাজটি এত ব্যাপক হলো, যার ফলে বাংলা হরফ ঠিক থাকল বটে, কিন্তু রক্তে-মাংসে সে ভাষা হয়ে উঠল অনেকাংশেই সংস্কৃত; যা ছিল আসলে বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখারই নামান্তর। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের হিংসা ও আক্রোশ এড়িয়ে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে বাংলা ভাষা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রেখেছিল। অথচ ইতিহাসের এই পর্যায়ে ইঙ্গ-হিন্দু মিলিত ষড়যন্ত্রের মুখে বাংলা ভাষা আখ্যায়িত হলো বৈরী সংস্কৃত ভাষারই দুহিতা নামে।

এ প্রসঙ্গে কাজী আমিনুল ইসলাম লিখেছেন :

> "ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটে। ফলে বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার লোক মুসলমানদের মধ্যে থাকল না। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মঙ্গল-কাব্যরূপ সাহিত্য এগিয়ে গেল। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্য হতেই আধুনিক সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নাম জড়িয়ে যে সাহিত্য, তারই মধ্যে তারা বিচরণ করে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলাকে আনলেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঘুরে গেল। একচেটিয়াভাবে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যকে লালন করাতেই সাহিত্যের যে মুসলিম ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহারের গন্ধ ছিল, তা সরে গেল। ভারতচন্দ্র হতে আরম্ভ করে নন্দকুমার, জগতধীর রায় প্রভৃতির যে বাংলা ভাষায় আরবী ফারসি শব্দের প্রাধান্য ছিল তা মুছে গেল। সেই থেকে ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিল।" (কাজী আমিনুল ইসলাম বাংলার রূপরেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৭-৭০)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ মোড় পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াল, বাংলা ভাষা মুসলমানদের মাতৃভাষা কি-না, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে কি-না, সে সম্পর্কেও নানা দ্বিধা-সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বাংলার মুসলমান বাঙালি, যখন হতে বাঙালির জন্ম (পাল-যুগ), তখন হতে তাদেরও জন্ম। (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৭)

এই ঐতিহাসিক সত্যও অনেকেই বিস্মৃত হয়ে বসে। এ প্রসঙ্গেই মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ লিখেছেন :

> "পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পরিবর্তন এবং বাংলা গদ্যের চর্চায় বাঙালি মুসলমানের আত্মনিয়োগ ও সাধনার ব্যাপারটি বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের উত্তরাধিকার রয়েছে কি না এসব প্রশ্নও অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের মনে নানা দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সংশয় ও আলোড়ন বিলোড়নের জন্ম দেয় এবং এ নিয়ে কম বাক-বিতণ্ডাও হয়নি।" (মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫)

বাংলা ভাষার এ অবস্থার জন্য পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ই যে কারণ ছিল, সে সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন :

> "যদি পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলা হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।" (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত পৃষ্ঠা ৪২১)

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়

মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে ইসলামী শরীয়তের আলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে মুফতী, কাজী, মুহতাসিব ও নায়েব নিযুক্ত করা হতো। তারা মুসলমানদেরকে শরীআতের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন, তাদের ধর্মীয় সমস্যাগুলো সমাধান করতেন এবং ঈমান-আকীদার হেফাযতের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করতেন, বিয়ে-শাদী পড়াতেন, জানাযা ও জুমআর নামায প্রভৃতিতে ইমামতি করতেন। এভাবে মুসলমানদের ইসলামী জীবনের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ইংরেজরা মুসলিম শিক্ষা ও বিধি-বিধানের এই অত্যাবশ্যকীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। এই স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে পীর-ফকীর-খন্দকার প্রভৃতি নামে একশ্রেণীর 'ধর্মীয় নেতা'র আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্রভাব নিজ নিজ মুরীদদের মধ্যেই সীমিত ছিল। সাধারণ মুসলিম জনগণের তত্ত্বাবধান তারা করতেন না।

মুসলিম সমাজে এ সময় বিভিন্ন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে। একদল স্বল্পশিক্ষিত পীর-ফকীর-খন্দকার এসব সমস্যার মোকাবিলা না করে বরং সেগুলোকে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় দেখা দেয়। তাদের বিপথগামী হওয়ার পথ অবারিত হয়। প্রতিবেশি হিন্দুদের প্রভাবে ও অনুকরণে বহু কুসংস্কার ও শরীআত পরিপন্থী রীতি-রেওয়াজ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু ধর্মীয় বহু অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার-আচরণ এ সময় ঢুকে পড়ে তাদের ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়। অনেকে সেগুলোকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে জাতে তোলার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম সমাজে মা বরকত, ওলা বিবি ও শীতলা দেবীর পূজা, কালোজিরা পড়া, কাঞ্জিপড়া, তাবীজ-কবজ ইত্যাদি বহু নতুন উপসর্গ বেশ শক্তিশালী হয়ে আসন গেড়ে বসে। হিন্দুদের মনসা পূজার অনুকরণে খোয়াজ খিজিরের পূজা, দূর্গাপূজা-দশোহরার অনুকরণে মুহররমের দশ তারিখে হাসান-হুসাইনের তাজিয়া বিসর্জন, হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের অনুকরণে মুসলিম সমাজে নানা পার্বণ চালু হয়।

পলাশীর পরাজয় মুসলিম সমাজ-জীবনে যে সর্বমুখী বিপর্যয় ও অভিশাপ বয়ে আনে সে সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত মুখপাত্র ইউলিয়াম হান্টার ১৮৭২ সালে লিখেছেন :

> "তারা (মুসলমানরা) অভিযোগ করেছে যে, তাদের ধর্ম প্রচারকদের সম্মানজনক জীবন-যাপনের প্রতিটি রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। ...... আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি, যার ফলে তাদের গোটা সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং তারা ভিক্ষাবৃত্তি ও অবমাননাকর জীবন যাপনের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ..... তাদের যে সমস্ত আইন অফিসার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় অনুমোদন দান করতেন এবং যারা স্মরণাতীতকাল থেকে ইসলামী পারিবারিক

আইনের ব্যাখ্যা দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালন করে এসেছেন, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে আমরা হাজার হাজার পরিবারকে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি। ..... মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের আত্মার ওপর পীড়ন চালাচ্ছি। অসদুদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করেছি এবং তাদের শিক্ষা তহবিলের বিরাট অংক আমরা আত্মসাৎ করেছি। তারা প্রচার করে থাকে যে, আমরা যারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভৃত্য হিসেবে বাংলার মাটিতে পা রাখবার জায়গা পেয়েছিলাম, তারাই বিজয়ের সময় কোনরূপ পরদুঃখ-কাতরতা দেখাইনি এবং গর্বোদ্ধত রূঢ়তা প্রর্দশনের মাধ্যমে আমাদের সাবেক প্রভুদেরকে কর্দমে প্রোথিত করেছি। এক কথায়, ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীন, অনুদান ও নিকৃষ্ট তহবিল তসরুফকারী এবং দীর্ঘ এক শতাব্দিব্যাপী অন্যায়কারী হিসেবে অভিযুক্ত করে থাকে।" (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১২৭, ১২৮)

পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলার মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন :

"বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াফত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি– পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব-রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে।" (ড. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)

ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে শঠতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্রে ও বিভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ভাগিদার হিন্দু শেঠ বেনিয়ারাও কখনো সে প্রতারণার শিকার হয়ে জব্দ হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা এই হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক বিবেচনা করে যেটুকু করুণা বর্ষণ করেছে, তার দ্বারা তাদের ঋণ শতকরা শত ভাগের বেশিই শোধ হয়েছে। বাংলার মুসলমানদের জন্য যা ছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম বিপদ-বিপর্যয়, এই বর্ণহিন্দু শ্রেণীর জন্য তা ছিল প্রভু পরিবর্তন এবং নব্য-প্রভুর কিঞ্চিত আশীর্বাদে জীবনের সকল দিক কানায় কানায় পূর্ণ ও পুষ্ট করার সুযোগ। সে কারণেই মুসলমানদের লাঞ্ছনার পটুভূমিতে বঙ্কিম-গুরু ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হলো ইংরেজ-প্রভুর বিজয়-বন্দনা :

"ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।"

৬.

পলাশী বিপর্যয় ও কলকাতার উত্থান

পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্যাস্ত ঘটল ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। পলাশীর শিবিরে দু'দিন সসৈন্যে অবস্থান করলেন ক্লাইভ। তারপর দু'শ 'ইংরেজ ও পাঁচশ' দেশীয় সৈন্য নিয়ে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা নীরবে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এই মোড় পরিবর্তনের ঘটনার সাক্ষী হলো। ক্লাইভ নিজে স্বীকার করেছেন ঃ

> "ইচ্ছা করলে মুর্শিদাবাদের জনতা শুধু লাঠি আর পাথর মেরে এই নতুন বিজেতাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারত। লোকেরা নাকি বলাবলিও করেছে, কোন অস্ত্র ছাড়া শুধু ইটপাটকেল মেরেই মুর্শিদাবাদের লোকেরা ইংরেজদের ধরাশায়ী করতে পারত।" (ভোলানাথ চন্দ্র : দি ট্রাভেল অব এ হিন্দু, লন্ডন, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৬৮)

মুর্শিদাবাদের লুটপাট : উত্থানের সূচনা

পলাশী বিপর্যয় মুর্শিদাবাদে সাথে সাথেই কোন বড় রকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায় না। শাসক মহলের অন্তঃপুরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আর বিশেষ সম্প্রদায়ের 'বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষয়রোগ' জাতির প্রতিরোধ-চেতনা পঙ্গু করে ফেলেছিল। শাসক ও জনতা ছিল আত্মিক সম্পর্কহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। উদ্যমহীন এই নিস্পৃহ মানুষেরা অবাক চোখে দেখল মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনের ঘটনা। ক্লাইভের নিজ তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ নিঃশেষে লুণ্ঠিত হলো। এরপর ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই পুতুল নবাব মীর জাফর আলী খাঁ রাজকীয় শান-শওকতের সাথে ইংরেজদের 'যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের' প্রথম কিস্তির টাকা কলকাতায় পাঠালেন সোনা-চাঁদির মাধ্যমে।

> "সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা দুই শত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইল।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার)

কলকাতার উত্থানের সূচনা এখান থেকেই। মুর্শিদাবাদের জনগণ এবারে তাদের অন্তরে একটা অব্যক্ত জ্বালা অনুভব করল। কোথায় যেন একটা বড় রকম ছন্দপতন ঘটে গেছে!

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করলো ২ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর বাইরে ব্যক্তিগত পারিতোষিক আর উপহার উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ৫৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত 'নবাব উঠানো-বসানো'র রাজনীতি করে কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারী প্রচুর অর্থ-কড়ির মালিক হলো। নানা অজুহাতে কোম্পানি করল বিস্তর আয়-রোযগার। সেই অর্থের পরিমাণ এক কোটি ৪৫ লাখ ২ হাজার ৫৬৬ পাউন্ড। তখনকার হিসেবে তেরো কোটি টাকা। (ব্রিজেন কে গুপ্ত : সিরাজউদ্দৌলা এন্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃষ্ঠা ১২৬-২৭) মীর জাফর-মীর কাসিম- নাজমুদ্দৌলার নবাবীর মাশুলে ক্লাইভ আর ভেরেলস্টের ব্যক্তিগত বখরা ছিল ২১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৬৫ পাউন্ড। (রমেশচন্দ্র দত্ত : ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১৭৫৭-১৮৩৭, পৃষ্ঠা ৩২) এছাড়া ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বার্ষিক তিন লাখ টাকা আয়ের জায়গীর। এই বিরল সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে এদেশ থেকে ক্লাইভ-ভেরেলস্ট-এর দ্বারা বিতাড়িত ইংরেজ কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস লিখেছেন :

> "The plunder which the superior servants of the Company acquired in the year 1757 ..... suddenly enabled many of them to return to England with princely fortune." (Considerations on Indian Affairs, part-II, London, 1775. P-3)

ইংরেজদের লুণ্ঠন সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

> "নবাবের সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত করে, জমিদারী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করে এবং আরও নানা উপায়ে উৎকোচ-উপঢৌকন নিয়ে চার্ণক-হেজেস-ক্লাইভ-হেষ্টিংস-কর্নওয়ালিসের আমলের কোম্পানির কর্মচারীরা যে কি পরিমাণ বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় না।... দেখতে দেখতে প্রচুর অর্থ ও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কোম্পানি সাহেবরা সত্যি সত্যি নবাব বনে গেলেন। তাদের মেজাজ ও চালচলন সবই দিন দিন নবাবের মতো হয়ে উঠতে লাগল।" (কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

'হঠাৎ-নবাব' এই ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে এসেছিল বার্ষিক পাঁচ, দশ, পনের কিংবা পঁচিশ পাউন্ড বেতনের 'রাইটার', 'ফ্যাক্টর', 'জুনিয়র মার্চেন্ট' বা 'সেমি-মার্চেন্ট' হিসেবে। 'লোফার'শ্রেণীর এই ইংরেজ কর্মচারীরাই স্বনামে-বেনামে বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন-শোষণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে কাড়ি কাড়ি টাকা পাচার করে নিজ দেশেও 'কিংবদন্তীর রাজপুত্তুরের' ইমেজ অর্জন করেছিল। কোম্পানির 'দস্তক'র অপব্যবহার করে পাঁচ পাউন্ড বেতনের কর্মচারীরা এদেশে মুৎসুদ্দী-অর্থলগ্নিকারীর মূলধনে বছরে লাখ লাখ

টাকার ব্যবসা করছিল। তার ওপর ছিল নানা প্রকার ঘুষ ও উপঢৌকন। তাদের ব্যবসায়িক লুণ্ঠনের প্রধান অবলম্বন এ দেশীয় বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, গোমস্তা, দালাল ও ফড়িয়ারা। তাঁতি আর কামারশ্রেণীর গরীব উৎপাদকদের কাছ থেকে টাকা লুট করেও তারা বখরা তুলে দিত এসব ইংরেজ কর্মচারীর হতে। এভাবেই কোম্পানির বার্ষিক পাঁচ পাউন্ড বেতনের কেরানী হয়ে ১৭৫০ সালে এ দেশে এসে ওয়ারেন হেস্টিংস চৌদ্দ বছর পর দেশে ফিরেছিলেন ত্রিশ হাজার পাউন্ড সাথে নিয়ে। এরপর দ্বিতীয় দফায় গভর্নর জেনারেলরূপে যখন তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে, বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য রূপান্তরের তখন তিনিই প্রকৃত প্রতিনিধি।

এভাবেই স্বল্প বেতনভুক 'বণিক নাবিক আর লোফার' ইংরেজ কর্মচারীরা 'বেঙ্গল নেবুব'-এ পরিণত হলো। আর তাদের এ দেশীয় লুণ্ঠন-সহচর দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দীরা দালালীর মাহাত্ম্যে রাতারাতি পরিণত হলো রাজা-মহারাজায়। এই সম্মিলিত লুটেরা চক্রটি সম্পর্কেই ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছেন : "প্রথমে কোলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কতগুলো ভাগ্যবিতাড়িত, চরিত্রভ্রষ্ট, ধূর্ত, পলাতক, অল্প শিক্ষিত লোক বেনিয়া-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা-কেরানী-ফড়িয়া দালালরূপে অবাধে অঢেল অজস্র কাঁচা টাকা অর্জন ও সঞ্চয়ের দেদার সুযোগ পেয়ে ইংরেজদের এ দেশে উপস্থিতিকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে জানল ও মানল।" (বঙ্কিম বীক্ষা– অন্য নিরিখে, ভাষা-সাহিত্যপত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৮২)

পলাশীর বিপর্যয়ের ফলে এই দাঁওবাজ মাস্তানশ্রেণীর লোকেরাই হলো এদেশের 'ভাগ্য বিধাতা'। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দেওয়ানি কর্তৃত্ব লাভের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই সম্মিলিত লুটেরাচক্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। তাদের হাতে বাংলাদেশের হাজার বছরের শিল্পের গৌরব মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে অবিশ্বাস্য কল্পকাহিনীতে পরিণত হলো। ইংরেজদের সৃষ্ট শুল্ক-প্রতিরোধ নীতির ফলে এ দেশের বিশ্বখ্যাত সূতি বস্ত্র ও রেশম-বস্ত্র ধ্বংস হলো। কুটির শিল্প হলো বিপর্যস্ত। আগে বাংলাদেশের কাপড় বিলাতে রফতানী হতো। এখন ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র আমাদের বাজার দখল করল।

কলকাতার 'অবাক উত্থান' : ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে অন্ধকার

পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাংলার প্রধান শিল্পনগরী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে দ্রুত ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকার। জনগণ শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। এসব শহরের জনসংখ্যা কমছিল দ্রুত, আর অন্যদিকে তখন কলকাতায় বইছিল সমৃদ্ধির জোয়ার। লুটেরা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য, আর তাদের লুণ্ঠনবৃত্তির জুনিয়র পার্টনার এদেশীয় দেওয়ান-বেনিয়ান-গোমস্তাদের উদ্যোগে তখন সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা-চিতপুর-বিরজি-চক্রবেড়ি গ্রামগুলোর ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকে দ্রুত বেড়ে উঠছিল টাউন

কলকাতা। কলকাতার এই উত্থান সম্পর্কে নারায়ণ দত্ত লিখেছেন :

> "জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা।" (জন কোম্পানির বাঙ্গালি কর্মচারী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৩)

কাদের নিয়ে জাগল এই কলকাতা? এরা কারা? এ প্রসঙ্গে আবদুল মওদুদ লিখেছেন :

> "আঠার শতকের মধ্যভাগে কলকাতা ছিল নিঃসন্দেহে বেনিয়ানের শহর– যতো দালাল, মুৎসুদ্দী, বেনিয়ান ও দেওয়ান ইংরেজদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের মধ্যবর্তীর দল। এই শ্রেণীর লোকেরাই কলকাতাতে সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ও বশংবদ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৮২)

বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল 'নাবিক, সৈনিক ও লোফার'– এই তিন শ্রেণীর ইংরেজের হাতে। তাদের দেওয়ান, বেনিয়ান ও দালালরূপে এদেশীয় একটি নতুন শ্রেণী রাতারাতি কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হয়ে ইংরেজদের জুনিয়র পার্টনাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'টাউন কলকাতার কড়চা' বইয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

> "…. ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে, আঠার শতকের মধ্যে কলকাতা শহরে যে সমস্ত কৃতি ব্যক্তি তাদের পরিবারের আভিজাত্যের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা অধিকাংশই তার রসদ (টাকা) সংগ্রহ করেছিলেন বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ীদের দেওয়ানি করে। …. এক পুরুষের দেওয়ানি করে তারা যে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, তা-ই পরবর্তী বংশধরদের বংশ পরম্পরায় আভিজাত্যের খোরাক যুগিয়ে এসেছে…..। বেনিয়ানরা …. ছিলেন বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রধান পরাশমর্শদাতা। …. আঠারো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের কর্মচারীরা এ দেশে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন, তখন দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না বলা চলে। সেই জন্য তাঁদের ব্যবসায়ের মূলধন নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ– প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই পদে পদে যাদের ওপর নির্ভর করতে হতো তাঁরাই হলেন বেনিয়ান। এই বাঙালি বেনিয়ানরাই প্রথম যুগের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দোভাষী ছিলেন, বাণিজ্য প্রতিনিধি ছিলেন, হিসেব রক্ষক ছিলেন, এমনকি তাদের মহাজনও ছিলেন বলা চলে।" (টাউন কলকাতার কড়চা, বিহার সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৯০-৯১)

এই বাঙালি বেনিয়ানরা প্রথম যুগের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দোভাষী, বাণিজ্য প্রতিনিধি আর মহাজন শুধু ছিল না, তারা ছিল তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরও সহচর। ১৬৯০ সালে জোব চার্ণক হুগলী নদীর উজান বেয়ে যখন কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন,

তখন থেকেই এই শ্রেণীর সাথে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুবাদে গড়ে উঠেছিল এক ধরনের রাজনৈতিক গাঁটছড়া। আঠার শতকের শুরু থেকে সে সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। এ জন্যই দেখা যায় ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় যে ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করে, তারা সকলেই ছিল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক। ১৭৩৯ সালে কোম্পানি কাসিমবাজারে যে পঁচিশ জন ব্যবসায়ী নিয়োগ করে তাদেরও অভিন্ন পরিচয়। এভাবেই গড়ে ওঠে ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রী। মুসলিম শাসনের অবসানই ছিল এই মৈত্রীজোটের উদ্দেশ্য। (এস. সি. হিল তাঁর গ্রন্থ 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭'-এর ২৩, ১০২, ১১৬ ও ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণপঞ্জীসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।)

এই শ্রেণীর লোকেরাই বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। ব্যক্তিস্বার্থ ও সংকীর্ণ মোহাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশত এই শ্রেণীর লোকেরাই স্বাধীনতার পরিবর্তে পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিষয়টি খোলামেলা তুলে ধরে এম. এন. রায় লিখেছেন :

> "It is historical fact that a large section of Hindu community welcomed the advent of the English power." (India In Transition)।

আর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> "British could winover political authority without any opposition from the Hindus." (British Paramountcy and Indian Renaissance. Part-II, P-4)

এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিল ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রধান অবলম্বন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইজারা চুক্তি (১৭৭২-৯৩) এবং কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুবাদে এই শ্রেণীটিই তাদের অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকার জোরে জমিদারীর মালিক হয়ে দেশের কৃষকদের ওপর স্থায়ী দস্যুতা চালানোর জন্য 'বৈধ কর্তৃত্ব' নিয়ে চেপে বসেছিল। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা হিন্দু, গোত্রীয় পরিচয়ে দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিক, শীল, তিলি কিংবা সাহা, পূর্ব পরিচয়ে তাদের কেউ পাঁচ টাকা বেতনের সরকার বা কেরানী, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী কিংবা পুরনো জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা। আর তাদের সকলের অভিন্ন পরিচয়– তারা বাংলার নব্য প্রভু ইংরেজ বণিক-শাসকদের অনুগত দালাল। তারাই ইংরেজ কোম্পানির সমর্থনের ভিত্তি, বিদেশি প্রভুদের তারাই প্রকৃত রক্ষক। তাদের জমিদারী ছড়িয়ে ছিল বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায়। কিন্তু তাদের বসবাস নিজ জমিদারী এলাকা থেকে দূরে- সদ্য জেগে ওঠা শহর কলকাতায়।

এই নতুন জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভ দমনকারী শক্তিরূপে। পলাশীর পতনে তাৎক্ষণিকভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ-চেতনা শাণিত হয়ে উঠতে বিলম্ব হয়নি। ১৭৬৩ সালেই শাসক মীর কাসিম জাতির সর্বনাশ সম্পর্কে সম্বিত ফিরে পেয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করেছিলেন। আর একই সময়ে জনতার কাতার থেকে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের অমর নায়ক ফকীর মজনু শাহ। ইংরেজরা বাংলার সাবেক শাসক জাতির ব্যাপারে একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। লর্ড ক্লাইভ কোর্ট অব ডিরেক্টরকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "মুসলমানরা সব সময়ই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে জানলেই তারা সাথে সাথে তা সংঘটিত করবে।" (Selections from Unpublished Records of Govt.... 1748-67; James Long, 1973, P-202)

বিদ্রোহের এ আশঙ্কার কারণেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয়, তা কর্ণওয়ালিসের যবানি থেকেই খোলাসাভাবে জানা যায়। তার ভাষায় :

> "আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভূস্বামীদেরকে আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করতে পারে তার মনে তার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না।" (উদ্ধৃত : বদরুদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২২)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজদের জন্য ধারণাতীত সাফল্য বয়ে এনেছিল। তাই, ইংরেজদের ওপর চরম আক্রোশ নিয়ে বাংলাদেশের নির্যাতিত কৃষকরা যখন যুদ্ধরত, 'মুসলমান মাত্রই রাণীর বিদ্রোহী প্রজা'-রূপে যখন চিহ্নিত, মহীশূরের টীপু সুলতান-এর মরণপণ আজাদীর লড়াই-এর ফলে ইংরেজ শাসকদের যখন হৃৎকম্প উপস্থিত, তখন কলকাতার সদ্য বিকশিত এই শ্রেণীটি প্রকাশ্যে ইংরেজদের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণার মাধ্যমে প্রভুর শক্তি বৃদ্ধি করেছিল :

ইংরেজদের চরম দুর্দিনে ১৮৯৮ সালের ২১ আগস্ট বাংলার জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিভূরূপে কলকাতার সেরা ধনী গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, গোপিমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা এক সভা অনুষ্ঠান করে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। (সিলেকশন ফ্রম ক্যালকাটা গেজেট্‌স, ভল্যুম-৩, ডব্লিউ এস সিটনকার, পৃষ্ঠা ৫২৫, উদ্ধৃত স্বপন বসু : বাংলার নব চেতনার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান আযাদীর জন্য জীবন দিলেন। কর্ণওয়ালিস বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন কলকাতায়। 'কলকাতার প্রধান ব্যক্তিরা বাংলা ও ফারসি ভাষায় তাকে মানপত্র দিয়ে বরণ করে। (স্বপন বসু : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩)

মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তর হয় ১৭৬৮ সালে। ১৭৭৩ সালে দ্বৈত শাসন অবসানের সাথে সাথে কলকাতা ইংরেজদের ভারত-রাজত্বের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৭৭৪ সালে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট উদ্বোধন করেন। এ সময়ই তিনি কলকাতাকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তখনো কলকাতা ছিল গঞ্জ। তারপর কলকাতা হলো বন্দর। ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচারের সদরঘাট ছিল এই কলকাতা বন্দর। বন্দর থেকে ক্রমে বিকশিত হলো বন্দরনগরী। এভাবেই সারা বাংলা সম্পদ শোষণ করে বেড়ে উঠল কলকাতা মহানগরী।

এই হঠাৎ বেড়ে ওঠা কলকাতার অতীত সম্পর্কে স্বরূপচন্দ্র দাস লিখেছেন :

> "পূর্বকালে এ নগর নবদ্বীপাধীন এক ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। তাতে অনেক দূর পর্যন্ত ছিল বন-জঙ্গল। এই স্থানে ১০ কিংবা ১২ ঘর কৃষিজীবী গৃহস্থ বাস করত।" (দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৩৯)

নিশীথরঞ্জন রায় জানাচ্ছেন :

> "জলাজঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিল জেলে, শিকারি, শবর প্রভৃতি তথাকথিত জাতির নর-নারী।" (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৭)

এই গ্রাম-কলকাতার পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিল চারটি বসাক ও একটি শেঠ পরিবার। তার পাশেই সূতা ও কাপড়ের বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুতানুটি। এই গোবিন্দপুর-ডিহি কলকাতা-সুতানুটি গ্রাম তিনটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ১৬৯৮ সালে সাবর্ন চৌধুরীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। তারপর পাঁচ বছর ধরে সেখানে উইলিয়াম দুর্গ তৈরি করেছিল। (ভারতকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৯)।

কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদী অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক ছিল। তার চাইতেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতার গুরুত্ব ছিল এ দেশের শাসকদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার চমৎকার আশ্রয়কেন্দ্ররূপে। জোব চার্ণক হুগলি থেকে পালিয়ে গিয়ে এই স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও জঙ্গলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নদীপথে সাগরে পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচানোর জন্যও এই কলকাতা ছিল তুলনাহীন। এসব কারণেই ইংরেজরা এই জায়গাটিকে তাদের 'অভয়ারণ্য'রূপে বেছে নিয়েছিল। শক্তিশালী সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি তারা তাদের চার পাশে দাঁওবাজ দালালশ্রেণীর দ্বারা গড়ে তুলেছিল দুর্ভেদ্য 'মানব বন্ধনী'। ইংরেজদেরকে অবলম্বন করে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত দেড় শতাধিক বছর ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর

উতরিয়ে উঠে গেছে একবারে শীর্ষদেশে, আর তাদের উত্থান-আরোহণের কার্যকারণরূপে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান প্রজাসাধারণ পতনের একটি পর একটি ধাপ গড়িয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল গভীরে। একদিকে শোষক-ধনিক-জমিদার বর্ণহিন্দুদের উত্থান, অন্যদিকে বাংলার কৃষক-প্রজা মুসলমানদের পতন, এই দু'য়েরই মধ্য-বিন্দুতে কলকাতা।

কলকাতার বাবু জাগরণ

কলকাতার লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজদের সাথে সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর লড়াইকে অভিহিত করেছেন 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে। বর্ণহিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে 'দেবাসুর' একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষ বঙ্গ-দ্রাবিড়গণ হানাদার আর্যদের আগ্রাসন দীর্ঘদিন পর্যন্ত রুখে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের মুখে বারবার পর্যুদস্ত হয়েই আর্যরা এ এলাকার দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীকে 'অসুর' নামে অভিহিত করেছিল। আর্যরা 'দেবতা' আর দ্রাবিড়রা 'অসুর'। এই 'অসুর' পরিচয়েই আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘদিন আর্যদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই প্রাচীন আর্যদের অধস্তন পুরুষ ভবানী চরণ বাংলার নতুন যুগের প্রতিরোধ সংগ্রামের বীর নায়ক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে 'অসুর' আখ্যায়িত করেছেন। তাদের চোখে পলাশীর 'দেবতা' হলো ইংরেজরা।

ভবানীচরণরা সিরাজকে 'অসুর' আর ইংরেজকে 'দেবতা' বলেই থেমে যাননি। মুখের কথার সাথে বাস্তব কাজের নমুনাও পেশ করেছেন। পলাশী যুদ্ধের ক'দিন পরই তারা পলাশীর দেবাসুর সংগ্রামকে উপজীব্য করে বাংলায় শারদীয় দুর্গাপূজা প্রথম চালু করেন। এর আগে বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল না। শ্রীরাধারমন রায় 'কলকাতার দুর্গোৎসব' নামক এই প্রবন্ধে লিখেছেন, দুর্গাপূজা 'পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব'। 'পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব' হিসেবেই এই পূজা ১৭৫৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া ও কলকাতায়। এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'পলাশী বিজয়ী' লর্ড ক্লাইভের সংবর্ধনা।

রাধারমণ রায় লিখেছেন :

> "১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর রণাঙ্গনে মীর জাফরের বেইমানির দরুন ইংরেজ ক্লাইভের হাতে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয় ঘটলে সবচেয়ে যাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র আর কলকাতার নবকৃষ্ণ। কোম্পানির জয়কে তাঁরা হিন্দুদের জয় বলে মনে করলেন। ধূর্ত ক্লাইভও তাঁদের সেরকমই বোঝালেন। ক্লাইভের পরামর্শেই তাঁরা পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব করার আয়োজন করলেন। বসন্তকালীন দুর্গাপূজোকে তাঁরা পিছিয়ে আনলেন শরৎকালে– ১৭৫৭ সালেই তাঁরা বহু টাকা খরচ করে শরৎকালীন দুর্গাপূজোর মাধ্যমে পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব পালন করলেন। এরপর ফি বছর শরৎকালে

দুর্গাপূজো করে তাঁরা পলাশীর যুদ্ধের স্মারক উৎসব পালন করেছেন আর অন্যান্য হিন্দু জমিদার বা ব্যবসায়ীদেরও তা পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। ... শোনা যায়, শরৎকালীন দুর্গাপূজো যে-বছর প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই ১৭৫৭ সালেই কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণ দু'জনেই লক্ষাধিক টাকা খরচা করেছিলেন। নবকৃষ্ণ টাকা পেয়েছিলেন সিরাজদৌল্লার গুপ্ত কোষাগার লুট করে। আর কৃষ্ণচন্দ্র টাকা পেয়েছিলেন ক্লাইভের প্রত্যক্ষ কৃপায়। ... আগে এদেশে বসন্তকালে চালু ছিল দুর্গাপূজো আর শরৎকালে চালু ছিল নবপত্রিকাপূজো। দুর্গাপূজোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মূর্তির ব্যাপার, আর নবপত্রিকা পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নটি উদ্ভিদের ব্যাপার। পরে এই দু'টি ব্যাপারকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলা হয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে নবপত্রিকা হয়েছেন দুর্গা। তাই শরৎকালে দুর্গাপূজোর বোধনের দরকার হয়। আর আগে নবপত্রিকা পূজো করে পুরে দুর্গাপূজো করতে হয়। ... তাহলে দাঁড়ালো এই : ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের বিজয়োৎসব পালন করার জন্যে বসন্তকালের দুর্গাপূজোকে শরৎকালে নিয়ে এসে নবপত্রিকাপূজোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ করেছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতার নবকৃষ্ণ। আর তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন ক্লাইভ। ক্লাইভ যে উৎসাহিত করেছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে নবকৃষ্ণের বাড়িতে পূজো অনুষ্ঠানে ক্লাইভের সপরিষদ উপস্থিতি। ... নবকৃষ্ণের পুরনো বাড়ির ঠাকুর দালানটি তৈরি হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। খুবই তড়িঘড়ি করে এটি তৈরি করা হয়েছিল। ... দুর্গাপূজোর চাইতেও ক্লাইভকে তুষ্ট করা ছিল নবকৃষ্ণের কাছে বড় কাজ। ... তিনি ভালো করেই জানতেন, সাচ্চা সাহেব ক্লাইভ ধর্মে খ্রিস্টান, মনে মনে মূর্তি পূজোর ঘোর বিরোধী। অতএব স্রেফ দুর্গাঠাকুর দেখিয়ে ক্লাইভের মন ভরানো যাবে না, এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি ক্লাইভের জন্যে বাঈ নাচের, মদ-মাংসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই একই সময়ে একই উঠানের একপ্রান্তে তৈরি করিয়েছিলেন ঠাকুরদালান, আরেক প্রান্তে তৈরি করিয়েছিলেন নাচ ঘর। ... নবকৃষ্ণর কাছে দুর্গাঠাকুর ছিলেন উপলক্ষ, ক্লাইভ-ঠাকুরই ছিলেন আসল লক্ষ্য। দুর্গাপূজোর নামে তিনি ক্লাইভ পূজো করতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় শরৎকালীন দুর্গোৎসব প্রবর্তনের সময় নবকৃষ্ণ সাহেবপূজোর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা পরে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে কলকাতার বাবুদের মধ্যে দুর্গাপূজো উপলক্ষে সাহেব পূজো নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হওয়ায়।" (রাধারমণ রায় : কলকাতা বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৮৩; দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা)

পলাশীতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে এই উৎসব কেন? এ বিজয় কার বিজয়? তার জবাব ভবানীচরণের জবানীতেই পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, পলাশীর লড়াইয়ের ফলে উঠে এসেছে 'হর্ষের অমৃত' আর 'বিষাদের

হলাহল'। 'হর্ষের অমৃত' পান করে কলকাতা হয়েছে 'নিরুপমা ও সর্ব্বদেশখ্যাতা'। কিন্তু 'বিষাদের হলাহল' কাদের ভাগ্যে জুটল, সে কথা কিছুই বলেননি ভবানীচরণ। 'দেবাসুর' সংগ্রামের 'বিষাদের হলাহল' গিলতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদ আর ঢাকা শহরকে।

ভবানীচরণ লিখেছেন : "ধার্ম্মিক, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম-প্রবর্তক, দুষ্ট নিবারক, সৎ প্রজাপালক, সদ্বিবেচক ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর" এই দেশের লোকদের "অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা" সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ইংরেজ তাই দেবতা। ক্লাইভ 'মা দুর্গার প্রতীক'। এই দেবতার পূজা করেই পলাশী-উত্তর কলকাতাকে কেন্দ্র করে রাতারাতি একটি লুটেরা শ্রেণী রাজা-মহারাজায় পরিণত হয়েছিল। ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানার ১৮৩৯ সালের সরকারি নথিপত্র থেকে গবেষক বিনয় ঘোষ সেকালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানদের একটি তালিকা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তুলে দিয়েছেন 'টাউন কলকাতার কড়চা' নামক বইতে। এই পরিবারগুলো শহর কলকাতার 'প্রাতঃকালীন গাত্রোত্থানের' সাথে যুক্ত। তাদের কয়েকজন হলেন :

১. মীর জাফরের নবাবী আমলের ক্লাইভের দেওয়ান নবকৃষ্ণের পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ বাহাদুর, ২. নবকৃষ্ণের ভাতিজা বাবু গোপীমোহন দেব, ৩. কর্নেল ক্লাইভের বেনিয়ান লক্ষীকান্ত ধরের উত্তর পুরুষ রাজা রামচন্দ্র রায়, ৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুণ্ঠন-বৃত্তির কুখ্যাত সহযোগী মল্লিক পরিবার, ৫. ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রাজস্ব বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাতি বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ, ৬. গভর্নর ভান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান রামচরণ রায়ের উত্তর পুরুষ আন্দুলের রায় বংশ, ৭. ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ও পরে সন্দীপের জমিদার গোকুল চন্দ্র ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত খিদিরপুরের গোকুল পরিবার, ৮. হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পরিবার, ৯. ঠাকুর পরিবারের 'জুনিয়র ব্রাঞ্চ' বা 'নবীন শাখা' নামে পরিচিত এবং কোম্পানি সরকারের এজেন্ট, পরে ২৪ পরগনার কালেক্টর ও নিমক এজেন্টের সেরেস্তাদার থেকে নিমক মহলের দেওয়ান ও স্বল্পকালীন কাস্টমস-সল্ট-ওপিয়াম বোর্ডের দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৭৯৪) পরিবার। 'কার ট্যাগোর এন্ড কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথের প্রভাব প্রতিপত্তির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সমসাময়িককালে ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই আমলের অন্যান্য অভিজাত পরিবার হলো– ১০. সুতানুটি বাজারের প্রতিষ্ঠাতা শেঠ পরিবার, ১১. মেসার্স ফেয়ারলি এন্ড কোং-এর দেওয়ান রামদুলাল দে, ১২. ভুলুয়া (নোয়াখালি) ও চট্টগ্রামের নিমক মহলের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাস, ১৩. পাটনার চিফ মি. মিডলটন ও স্যার টমাস রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, ১৪. কোম্পানি আমলের কলকাতার দেওয়ান গোবিন্দরামের পরিবার, ১৫. কুমারটুলির মিত্র

পরিবার, ১৬. কোম্পানির ঠিকাদার গোকুল মিত্রের পরিবার, ১৭. পামার কোম্পানির সরকার গঙ্গা নারায়ণ, ১৮. পাল চৌধুরীর পরিবার, ১৯. কুলীন ব্রাহ্মণ ব্যানার্জী পরিবার, ২০. ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সরকার রামলোচনের প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবার, ২১. ক্লাইভের দেওয়ান কাশীনাথের পরিবার, ২২. কোম্পানির হুগলীর দেওয়ান শ্যামবাজারের বসু পরিবার, ২৩. কোম্পানি সৈন্যদের রসদ সরবরাহের ঠিকাদার ও কয়েকজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর বেনিয়ান এবং মেসার্স মুর হিকি এন্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীলের প্রতিষ্ঠিত কলুটোলার শীল পরিবার, ২৪. এককালের লবণের গোলার মুহুরী বিশ্বনাথ মতিলালের পরিবার, ২৫. ঠনঠনিয়ার ঘোষ পরিবার, ২৬. মেসার্স ভেভিডসন এন্ড কোম্পানির এককালের কেরানী রসময় দত্তের প্রতিষ্ঠিত রামবাগানের দত্ত পরিবার, ২৭. পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালি সরকারের প্রতিষ্ঠিত কুমারটুলীর সরকার পরিবার, ২৮. আফিমের এজেন্ট হ্যারিসনের দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জীর প্রতিষ্ঠিত বাগবাজারের মুখার্জী পরিবার, ২৯. বেনিয়ান রামচন্দ্র মিত্রের পরিবার, ৩০. বিভিন্ন বিলাতি কোম্পানির সাথে যুক্ত গঙ্গাধর মিত্রের প্রতিষ্ঠিত নিমতলার মিত্র পরিবার।" (টাউন কলকাতার কড়চা, পৃষ্ঠা ৭৭-৮৮)

কলকাতার এই অভিজাত পরিবারগুলোর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

> "কেউ বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়ে, কেউ সর্দারী-পোদ্দারী করে, কেউ দাদনী বণিক ও দালাল হয়ে, কেউ বেনিয়ানী করে, কেউ বা ঠিকাদারি করে, কেউ বা ঠিকাদারি ও স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কলকাতার নতুন শহুরে সমাজে নতুন বড় লোক হয়েছিলেন। সেকালের নবাবী আমলের বড়লোকরা নবযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। কোম্পানির আমলে যাঁরা নতুন বড়লোক হলেন তাঁদেরকে এক পুরুষের বড় লোক বললে ভুল হয় না।" (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১০৩)

উপরের তালিকার 'এক পুরুষের বড় লোক' ত্রিশটি পরিবারের সবক'টিই বাঙালি হিন্দু। তাদের অধিকাংশই উচ্চ-বর্ণজাত। মুসলিম শাসনের অব্যবহিত পরের এ তালিকা! অথচ এতে একটিও মুসলিম পরিবারের নাম নেই। এখানেও 'চিরায়ত ঐতিহ্যের বিব্রতকর অনুশীলন'! পাল, সেন, তুর্কী, পাঠান, মোগল শাসনামলে সকল উত্থান-পতনের রাজনৈতিক বিবর্তনে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ– উচ্চবর্ণ হিন্দুর এই সম্মিলিত শক্তিই শাসন-যন্ত্রের ছত্র-ছায়ায় সমাজে একটানা প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ইংরেজ শাসনেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।

কলকাতার বর্ণহিন্দু অভিজাত শ্রেণীটির আত্মপ্রতিষ্ঠার সে বাস্তব চিত্র বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণীতে পাওয়া যায় তা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা-চিৎপুর-বিরজি-

চক্রবেড়ি গ্রামগুলির ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকে টাউন কলকাতার দ্রুত বেড়ে ওঠার কারণ এবং ইংরেজদের দ্বারা নব্য-সৃষ্ট শ্রেণীটির অবাক উত্থানের কারণ সম্পর্কে এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায়।

সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

> "বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিগিরি, লবণের ইজারা, প্রভৃতির মারফত যাহারা প্রভূত ধন-সম্পদ আহরণ করিয়াছিল, তাহারা এবং মার্ক্সের ভাষায় 'শহরের চতুর ফড়িয়া ব্যবসায়ীগণ' ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে.. নতুন জমিদার শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই নতুন জমিদার শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্য ছিল– ইংরেজ শাসকগণের প্রতি অচলা ভক্তি.... এবং কৃষির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শহরের অবস্থিতি, গ্রামাঞ্চলের ভূসম্পত্তি হইতে ইজারা মারফত অনায়াস-লব্ধ অর্থবিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন এবং 'বেনিয়ান', লবণের ইজারাদার প্রভৃতি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বগ্রাসী ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ট সহযোগিতা। ইংরেজ-সৃষ্ট এই নতুন বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীটি ভূসম্পত্তির উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়া সমসাময়িক বঙ্গদেশের নতুন অভিজাত শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রভৃতি ছিলেন এই অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য। .... সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যখন বাংলার তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন .... (এই শ্রেণীটি) সংগ্রামরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল।"
> (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯)

এই লুটেরা শ্রেণীর হাতে পলাশী-উত্তরকালে তাদেরই রুচি অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল কলকাতা। সে কারণেই স্বাধীন মেজাজে মধ্যযুগে গড়ে ওঠা সোনারগাঁও, গৌড়, ঢাকা কিংবা মুর্শিদাবাদের সাথে কলকাতার কোন মিল ছিল না। একদিকে ইংরেজ কোম্পানির রাইটার-ফ্যাক্টর-সেমি মার্চেন্ট প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ কর্মচারী, অন্যদিকে তাদের লুণ্ঠন-সহচর দালাল শ্রেণী। তাদের হাতে বেড়ে ওঠা কলকাতায় জন্ম নিল এক নতুন সংস্কৃতি, যার নাম 'বাবু কালচার'।

কলকাতার 'বাবু' সম্পর্কে জে. এইচ ব্রুমফিল্ড তাঁর গ্রন্থ 'এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি'-তে লিখেছেন :

> "Babu : In Bengali a title of respect for an English speaking Hindu. Applied derogatorily by the British to semi educated Bhadralok and by extension to any Bhadralok."

'বাবু' শব্দটি কোম্পানির শাসনের জন্ম-স্থিতি-বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করে আবুল কাশেম চৌধুরী লিখেছেন :

> 'ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে যখন স্বাধীনতা দ্রুত অপসৃয়মান, বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ কুটীর শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য, তখনই এই সামাজিক বিকলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিচ্ছে এই বাবু সমাজ ইংরেজদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে ।....... কালো পথে উপার্জিত বাবুদের অঢেল টাকা শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক ভূমিমুখীন অর্থনীতিতে আটকা পড়ে এবং তার কারণে সমাজকে বিসর্জন দিতে হয় সম্ভাব্য গতিশীলতা ।" (বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা : ৭২)

তিনি এই বাবু সমাজের পরিচয় আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন :

> "কলিকাতাবাসী জমিদার শ্রেণী যারা আভিজাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে ক্ষীয়মান সমস্ত পরিবেশকে গৌজামিল দিয়ে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, তারাই ছিলেন 'বাবু' । .... এঁদের উদভ্রান্ত যৌবন কেটেছে বিদেশী বণিক শোষণে উৎক্ষিপ্ত সহজলভ্য ধনস্ফীতিতে ।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫)
>
> "কলকাতার এই 'বাবু'দের সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি ছিল টাকা। সেই টাকার প্রাপ্তি ঘটেছে ইংরেজদের লুণ্ঠন-সহযোগীরূপে। এভাবেই তারা সারা বাংলার রক্ত শোষণ করে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল প্রাচুর্যের পাহাড়। এই কালো টাকার মালিকদের পরিচয় ছিল ইংরেজদের দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, সরকার, কেরানী প্রভৃতি শত নামে। আরো ছিল কোম্পানির উকিল ও জমিদারির সেরেস্তাদার। ইংরেজরা তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতো 'ব্ল্যাক জেমিনদার'। দুর্নীতির নানা কানাগলিপথে ব্ল্যাক মানি অর্থাৎ লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছিল এদের ঘরে।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭)

এরূপ অনেক 'ব্ল্যাক জেমিনদার' বা 'ক্যালকাটা বাবু' দুই, চার, পাঁচ টাকা বেতনের কর্মচারী থেকে সে যুগের ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিল। রাম দুলাল দে পাঁচ টাকা বেতনের সরকার হিসেবে জীবন শুরু করেন। ১৮২৫ সালে মৃত্যুর সময় কলকাতা শহরে তিনি রেখে গেছেন উনিশটি বিশাল বাড়ি, আর সে আমলের পৌনে সাত লক্ষাধিক টাকার সম্পদ। কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু-লাটু বাবুরা ছিলেন তারই সন্তান। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল পুরাতন শিশি-বোতলের কারবার দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। আট টাকা বেতনের চাকরি শুরু করে রামকমল সেন মৃত্যুর সময় নগদ রেখে যান দশ লাখ টাকা। হেস্টিংস-এর মুৎসুদ্দীগিরি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাসিমবাজারের রাজপরিবার, যার বার্ষিক আয় ছিল তিন লাখ টাকা। (সিরাজুল ইসলাম, সূর্যাস্ত আইনের সামাজিক তাৎপর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৮৫)

এই কালো টাকার মালিকদের পরিচয় ছিল 'চতুর ও বুদ্ধিমান', 'শঠ ও প্রবঞ্চক', এবং 'হাজার রকম প্রতারণা-কৌশলের উদ্ভাবক'রূপে। টাকা-পয়সা উপার্জনে তারা যে অভিনব ব্যবসায়িক কৌশলের অবলম্বন করত তা প্রকাশ্য দস্যুতার শামিল। অন্যদিকে সেই লুণ্ঠিত সম্পদ খরচ করার ব্যাপারেও তারা ছিল বেহিসাবী। নানা প্রকার 'বাবু বিলাস' তখনকার কলকাতায় চালু হয়েছিল। বাইজী-চর্চা থেকে শুরু করে বুলবুলির লড়াই, টিকটিকির নাচ পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল তাদের বিকৃত রুচির তৃপ্তি সাধনের উপাদান। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ এমনকি গৃহ প্রবেশের মতো মামুলি উপলক্ষকে অবলম্বন করে তারা আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তার মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সে যুগের প্রায় কুড়ি লাখ টাকা খরচ করেছিল। তার নাতি লালা বাবুর 'অন্নপ্রাশন' উপলক্ষে সোনার পাতে দাওয়াত ছেপে বিলি করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে তার ঘরে 'পুরাণ' পাঠ করে গঙ্গাধর শ্রীমানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পারিতোষিক পেয়েছিল হাতী, ঘোড়া ও সুসজ্জিত পাল্কি। আশুতোষ দেবের মায়ের শ্রাদ্ধ আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাপের শ্রাদ্ধ সেকালের কলকাতার বাবু-বিলাসের এককেটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সারা বাংলায় তখন চলছিল ইংরেজ ও তাদের দোসর এই কলকাতা-বাবুদের লুণ্ঠণ-শোষণ। ইজারা চুক্তি, সূর্যাস্ত আইন, ব্যবসায়ের নামে লুটপাট প্রভৃতির ফলে একদা-সমৃদ্ধ পল্লীবাংলায় দোজখের আগুন জ্বলছিল। উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষে পল্লী বাংলার প্রতি ষোল জনে পাঁচ জন লোক মারা গিয়েছিল। বাংলার পুরনো শহরগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। মানুষ মানুষের গোশত খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করছিল। দেশের শিল্প-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্বাস নিংড়ে নিয়ে কোটি মানুষের রক্ত পান করে কলকাতায় তখন চলছিল এই প্রমত্ত বাবু-বিলাস।

এভাবেই কলকাতা বেড়ে উঠল। কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দুরা লুণ্ঠন-শোষণের বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল এবং এভাবেই উনিশ শতকের আশির দশকের মধ্যে তারা 'সবকিছু উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করে' নিজেদের মধ্যে 'নব জাগরণ' সৃষ্টি করল।

কলকাতার এই নবশক্তির উত্থান সম্পর্কে স্বপন বসু লিখেছেন :

> 'উনিশ শতকে বাংলায় শ্রেণীবিশেষের মধ্যে যে সব চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তার প্রায় সবটাই সীমাবদ্ধ ছিল বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে এই নব চেতনার ছোঁয়া লাগল না কেন?" (বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২০৭)।

স্বপন বসুর বক্তব্যেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> "মুসলমান নবাবের হাত থেকে ইংরেজ যেদিন বাংলা অধিকার করে নিল, মুসলমান সমাজের অবনতির সূচনা তখন থেকেই। নবাব পরিবার এবং তাকে কেন্দ্র করে

মুর্শিদাবাদে যে মুসলমান অভিজাত-মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল ইংরেজ রাজত্বে তাদের প্রতিপত্তির অবসান ঘটল। সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে তারা পাড়ি জমালেন দিল্লী বা পারস্যে। .... রাজধানীও মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত হলো কলকাতায়– ফলে মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ১৫% হ্রাস পেল। নবাবী আমলে অধিকাংশ উচ্চ পদই ছিল মুসলমানের অধিকারে, ইংরেজ আসার পর শাসন-ব্যবস্থা পুরো পাল্টে গেল। মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজ রাজ্য অধিকার করেছিলেন, সেই কারণে মুসলমানদের ইংরেজরা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। এদেশে আসার অল্পদিন পরেই রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে এক পত্রে জানান, মুসলমানরা সব সময়ই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত এবং সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে জানলেই তারা তা করবে। ... সামরিক বাহিনীতে যেসব মুসলমান উচ্চ পদে বহাল ছিলেন সহসা তারা অনুভব করলেন, তাদের দিন শেষ হয়েছে। সামরিক বিভাগের উচ্চ পদগুলো ইংরেজদের করতলগত হলো। অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে যেসব মুসলমান ছিলেন তাদের প্রভাব দ্রুত কমতে লাগল। ১৭৮১-তে মোগল ফৌজদারদের পদগুলোতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলো।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮)

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি পরিণত হলো পণ্যে। বহু বনেদী পরিবার রাতারাতি হলো পথের ভিখারী। অন্যদিকে ইংরেজ দেবতার পূজা-অর্চনা করে দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা শ্রেণীর লোকেরা জমিদারী কিনে হলো সামন্ত-অভিজাত। ১৮২৯ সালে বাজেয়াফত হলো লাখেরাজ সম্পত্তি। এই সব নিষ্কর জমির আয়ে পরিচালিত মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলো। সব দিক থেকেই নেমে এলো অন্ধকার। এরপর এলো রাজ-ভাষার ওপর আঘাত। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হলো অফিস-আদালতের ভাষা। হিন্দুরা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিল পুরনো নিয়মে। কিন্তু লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, অবদমিত, ক্ষুব্ধ, হতাশা-বিহ্বল, অভিমানাহত মুসলমানরা তখন সারা দেশে সুযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। বাঙালি হিন্দুঘরের ছেলেরা যখন ইংরেজি শেখার জন্য হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে দৌড়াচ্ছে তখনকার মুসলমান মাত্রই ছিল লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায়– 'মহারানীর বিদ্রোহী প্রজা'। কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দু নব্য বিকশিত বাবুশ্রেণী যখন লর্ড ক্লাইভকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করছে, পল্লী বাংলায় জনগণের মধ্যে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমে পুঞ্জিভূত হচ্ছিল চাপা ক্ষোভ আর ঘৃণা। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন :

"সারা বাংলায় ইংরেজদের অখ্যাতি এমন রটেছিল যে, একজন ইংরেজ কোন গ্রামে এলে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত, জনসাধারণও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে বাঁচত।" (দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১১২)

সাধারণভাবে পল্লী বাংলার মানুষ, আর বিশেষভাবে বাংলার মুসলমান জনগণ যখন লুণ্ঠন-শোষণের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তখন 'হর্ষের অমৃত' পান করে জেগে উঠছিল কলকাতা। কলকাতার এই জাগরণ বাংলার রেনেসাঁ বা বাংলার নব জাগৃতি নয়। এটাকে বড় জোর কলকাতার বাবু জাগরণ বলা যেতে পারে। কিন্তু ভবানীচরণের মতো সাধারণ লেখক থেকে শুরু করে যদুনাথ সরকারের মতো পণ্ডিত ঐতিহাসিকরা সকলে মিলে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বাবুজাগরণকেই বাংলার জাগরণরূপে প্রচার করেছেন। ভেদবুদ্ধি প্রসূত মোহাচ্ছন্নতায় এদের মধ্যে কোন ফারাক নেই। ভবানীচরণ পলাশীর যুদ্ধকে বলেছেন, 'দেবাসুর সংগ্রাম', আর যদুনাথ সরকারের ভাষায়, তা 'এক যুগান্তকারী ঘটনা'। ভবানীচরণ পলাশী যুদ্ধের ফলাফলকে বলেছেন 'হর্ষের অমৃত', আর যদুনাথ সরকার বলেছেন, 'পলাশী যুদ্ধের ফলে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল' এবং পলাশীতে ইংরেজ বিজয়ের ফলে 'মধ্য যুগীয় ধর্মীয় স্বৈরাচারী শাসনের' অবসান হয়েছিল। যদুনাথের মতে, ইংরেজ আমলে পশ্চিমা সভ্যতার পরশে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে জড়তা দূর হয়ে শুরু হয় নব জীবনের স্পন্দন। 'ভগবানের দান এক যাদুকরের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায়' যেন স্থবির প্রাচ্য সমাজে সঞ্চার হয় রেনেসাঁ বা নব জাগৃতি। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলার রেনেসাঁ তার চাইতেও 'ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্লবিক'।" (হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৯৮)

যদুনাথ সরকার-এর এই পর্যবেক্ষণ ও মতামত সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন :

> .... পলাশীর পরাজয়ের মধ্যে তিনি (যদুনাথ সরকার) যে যুগান্তকারী সুফল লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে নেহাতই একজন মস্তিষ্কস্নাত রাজভক্ত ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকের তথ্যশূন্য ভাবোদ্গার ও মনগড়া কল্পনা মাত্র। উনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে সর্বপ্রথম কোম্পানির সরকার দেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদানের নামে একটি মাত্র শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। এর পূর্বে পৌনে একশত বৎসর যাবত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হাজার হাজার মোগলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বন্ধ-প্রায় হয়ে যায়। ফলে দেশ নিপতিত হয় অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মহা তিমিরে। এটা কি রেনেসাঁ? উনিশ শতকের শেষ পর্বে এসে দেশীয়দের সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল উচ্চপদ লাভের বাধা উত্তোলন করা হয়। এর পূর্বে শত বৎসর যাবৎ সমস্ত দায়িত্বশীল উচ্চ বেতনের সরকারি চাকরি ছিল একচেটিয়া ইউরোপীয়দের জন্য রিজার্ভ। চাকরিহারা দেশের অগণিত পেশাদার পরিবার বেকার হয়ে নিঃস্ব নিস্তেজ সামাজিক বোঝায় পরিণত হয়। উত্তরোত্তর নগরায়ণ সভ্যতার অগ্রগতির লক্ষণ। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশের প্রত্যেকটি জনবহুল শহর, বন্দর, আর লয়প্রাপ্ত হয়ে পুঁতিগন্ধময় নোংরা জঞ্জালে পরিণত হয়। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া

> প্রভৃতি মহামারীতে মৃত্যু ও পলায়নের ফলে নাগরিক লোকসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ইহা কি রেনেসাঁ? বাংলার যে বস্ত্র ও রেশম-শিল্প ছিল একদা বিশ্বনন্দিত সে শিল্পের পতন ঘটে পলাশীর যুদ্ধের পর। বাংলাদেশ পরিণত হয় গ্লাসগো-ম্যানচেস্টারের বন্দীবাজারে (captive market)। ইহা কি রেনেসাঁ? কোম্পানির ভূমি-রাজস্বনীতির ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় অনার্জিত আয় ভক্ষণকারী উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন একটি সুবিধাভোগী জমিদার ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণী। রায়ত ভূমিতে চিরাচরিত অধিকার হারিয়ে পরিণত হয় জমিদারের করুণাপ্রার্থী প্রজায়। ইহা কি রেনেসাঁ? এসবই পলাশী যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের সুদূর প্রসারী ফল।" (বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩০-৩২)

একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য এটি অবশ্যই রেনেসাঁ ছিল। শ্রেণী পরিচয়ে তারা সামন্ত, ব্যবহারিক পরিচয়ে জমিদার, আর আভিজাত্যের কল্যাণে কলকাতার মানসপটে এরা ছিল বাবু নামে পরিচিত। রাজনীতিতে এরা ইংরেজদের বংশবদ দালাল, কিন্তু জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনের তারাই ছিল প্রকৃত নিয়ন্তা। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব মসনদ হারিয়েছিলেন আর এই নবোত্থিত বর্ণহিন্দুরা পেয়েছিল অনেক অনেক শ্বেতাঙ্গ নবাব। তাদের জন্যই পলাশীর পরাজয় এনেছিল নব জাগৃতি বা রেনেসাঁ। এই জাগৃতি বাংলার জাগরণ নয়, এটি নিতান্তই ছিল কলকাতার 'বাবু জাগরণ'।

উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের সূচনা থেকে একদিকে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, অন্যদিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দখল সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তারা শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় জীবনের দিকেও থাবা বিস্তার করেছিল। বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্ররূপে ১৮০১ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে নতুন বাংলা গদ্যধারার বিকাশ ঘটে। কলকাতাকেন্দ্রিক সদ্য বিকশিত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এ কাজে পরম উৎসাহে অংশ নেন। জনগণের মুখের ভাষার আদলে গড়ে ওঠা বাংলাকে বর্জন করে, সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী ছাঁচ বাঁচিয়ে তারা এক নতুন গদ্যভাষা নির্মাণ করেন। ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে নন্দকুমার, জগতধীর রায়ের সাহিত্যে মুসলমানের যবানী ভাষার যে প্রভাবটুকু ছিল, তা-ও তারা পরম যত্নে ধুয়ে-মুছে **সাফ** করে ফেলেন। এভাবেই খ্রিস্টান পাদ্রী ও তাদের জুনিয়র পার্টনার বর্ণহিন্দু পুরোহিতদের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার চেহারা বদলে গেল। মৃত সংস্কৃত ভাষা গৌরব **লাভ করল** একটি জীবন্ত, চলিষ্ণু ভাষার 'জন্মদায়িনী'রূপে, আর বাংলা ভাষার পরিচয় **ঘটল** 'সংস্কৃতের দুহিতা' নামে। বাংলা ভাষার এই মোড়

পরিবর্তনের কার্যকারণ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় : 'পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

> "বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হলো বৈদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধর হলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর 'বৈদেশীর ফরমাসে' 'সংস্কৃত সূত্রধর'দের দ্বারা করাত-চেরা হয়ে যে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা গদ্যের সূচনা হলো, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সে ভাষায়ই তখন থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র মাসিক 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিলে। সম্পাদক একজন ইংরেজ পাদ্রী। নাম জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তাঁরই সম্পাদনায় মাত্র এক মাস পর প্রকাশিত হয় আরো একটি সাময়িকপত্র– 'সমাচার দর্পণ', ১৮১৯ সালের ডিসেম্বরে। কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি প্রকাশ করে একটি ইংরেজি-বাংলা দ্বি-ভাষিক মাসিকপত্র 'গসপেল ম্যাগাজিন'। ১৮২২ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় 'খ্রিস্টের রাজ্যবৃদ্ধি'। খ্রিস্টধর্মের বাণী প্রচারের প্রেরণা নিয়ে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো সাময়িকপত্রের জন্ম একটি লক্ষণীয় বিষয়। ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের সাফল্যকে অবলম্বন করে এভাবে তাদের ধর্ম-কৃষ্টির বিজয় অর্জনের হাতিয়াররূপেই এ সকল সাময়িকপত্র চিহ্নিত।

খ্রিস্ট ধর্মের বাণীবাহী এসব সাময়িকপত্রের পাশাপাশি এ সময় থেকেই হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রচার, হিন্দু সমাজের সংস্কার ও হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মুখপত্ররূপে বিভিন্ন সাময়িকপত্র প্রকাশ পেতে থাকে। এগুলোর মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' (১৮১৮), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) সাপ্তাহিক 'শাস্ত্র প্রকাশ' (১৮৩০), 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), 'সম্বাদ সুধাকর' (১৮৩১) প্রভৃতি পত্রিকা বর্ণহিন্দুদের প্রকাশিত প্রথম যুগের সাময়িকপত্ররূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজদের দেওয়ানী, বেনিয়ানী, মুৎসুদ্দীগিরি, ঠিকাদারি ও অন্য আরো অনেক প্রকার দালালি করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ঘটে; তাদের জীবনে আসে রেনেসাঁ বা নব জাগৃতি। ফলে তাদের হাতে এই নতুন গণ-মাধ্যমটি নানা রূপ-বৈচিত্র্যে পল্লবিত হয়ে ওঠে।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একশ' বছর ধরে বাংলার মুসলমানগণ ছিলেন বিদেশী বেনিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধরত। তখন বর্ণ-হিন্দুরা নযীরবিহীন দালালির মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার বর্ণ-হিন্দু মধ্য -শ্রেণীটি ইউরোপীয় শিক্ষা- সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই শ্রেণীটির নেতৃত্বেই বর্ণহিন্দুদের নবজাগরণ

সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এই রেনেসাঁর নায়ক। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলো। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে রাজ-দরবারে আবেদন জানালেন রাষ্ট্রভাষা ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি চালুর জন্য। ১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালুর ফলে মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকরির দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় বাংলায় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের পতাকাতলে বাংলার মুসলমানরা একদিকে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, অন্য দিকে হিন্দু জমিদাররা ১৮৩৭ সালেই প্রতিষ্ঠা করেছিল 'ল্যান্ড হোল্ডারস এসোসিয়েশন' বা জমিদার সভা। ১৮৪৩ সালে তারা প্রতিষ্ঠা করে 'বেঙ্গল-ইন্ডিয়া সোসাইটি'। সারা ভারত জুড়ে যখন ইংরেজ উৎখাতের বিপ্লবী প্রস্তুতি চলছে তখন ১৮৫৩ সালে হিন্দু জমিদাররা প্রতিষ্ঠা করে 'বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস এসোসিয়েশন'। আর ১৮৫৬ সালে কলকাতার নব-উত্থিত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ইঙ্গ-হিন্দু স্বার্থের দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'।

সিপাহী বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির সুযোগে নবোত্থিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীটি ব্যাপকভাবে ইংরেজ প্রশাসনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-স্বার্থপরতা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-লোলুপতায় রূপ পেতে থাকে।

উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার, কর্ণেল টড প্রমুখ ইংরেজ লেখকের চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ও প্রাচীন হিন্দু-ঐতিহ্যভিত্তিক রচনাসমূহকে উপজীব্য করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয়। এভাবেই তাদের ধর্মীয় জাতীয়তারও সূচনা হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-চেতনার ভিত্তিতে তাদের জাতীয় মানস গড়ে উঠতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু, নবীগোপাল মিত্র প্রমুখ এই নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাণীবাহকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখক মুসলিম শাসনকে নির্বিচারে 'অত্যাচারী শাসন' বলে আখ্যায়িত করেন। তারা ইংরেজ শাসনের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে যেসব রাজপুত, মারাঠা ও শিখ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তাদেরকে এই লেখকরা বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। এই অভিন্ন ধারার অনুসারী বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লেখকেরা হিন্দুদের হিন্দুয়ানী রক্ষার জন্য 'নেড়ে দেড়ে যবনদের বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিবার' উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৃহদংশ জুড়ে বিপন্ন মুসলমানদেরকে একেবারে কর্দমে পুতে ফেলার আহ্বান প্রচার হতে থাকে। মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের পাশাপাশি হিন্দুরা একদিকে ইংরেজ তোষণ অন্য দিকে নিজ সম্প্রদায়ের জাগরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি-সংগঠন কায়েম করতে থাকেন।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীটির পরিচয় দিয়ে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গ সমাজ ছিল প্রধানত দুইটি মূলশ্রেণী লইয়া। ইহাদের একটি ইংরেজসৃষ্ট ভূস্বামী গোষ্ঠী এবং অপরটি কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক সম্প্রদায়। ... তৎকালের বিপুল কারিগর সম্প্রদায়ও কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ শাসনের কৃপায় জমিদার শ্রেণী সমাজ-শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভূমির পত্তনি-ব্যবস্থার মারফত জমিদার শ্রেণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ (তালুকদার) মধ্যশ্রেণীটিও জমিদারদের সহকর্মীরূপে সমাজের উচ্চ সীমায় আরূঢ় হইয়াছিল। ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতি এই সমবেত ভূস্বামী গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হওয়ায় সমাজের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইহারা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। ... ইহাদের জাতীয় চৈতন্য মোহাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যখন বাংলার তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশ, বিশেষত প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সংগ্রামরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯)

এই মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায় এই আন্দোলনের জনক। এটি ছিল নব্যসৃষ্ট জমিদারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ– এরা সবাই এই রেনেসাঁর নায়ক এবং 'কৃষক সংগ্রামের ভয়ে ভীত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর' প্রধান মুখপাত্ররূপেই তাদের মূল পরিচয়। বর্ণহিন্দু জাগরণের এই নায়করা উনিশ শতকে যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করেন, তা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতি বলতে তারা বুঝতেন হিন্দু জাতি। তাদের আদর্শেই কলকাতার বর্ণহিন্দু নেতাদের পরিচালনায় বিকাশ লাভ করেছে বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু জাতীয় আন্দোলন। কেননা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির নামে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যা কিছু আলোড়ন, তার অবলম্বন ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের বাণী।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীটি ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই উঠতি বর্ণহিন্দুদের পাশ্চাত্যমুখী প্রবণতা কেটে যেতে থাকে। তার পরিবর্তে সেখানে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ও ধর্মের প্রতি জেগে ওঠে নতুন আকর্ষণ। শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের মাঝে হিন্দু

দর্শন, হিন্দু সাহিত্য ও হিন্দু শিল্পের প্রতি একটা গর্বের ভাব জেগে ওঠে। ক্রমশ প্রাচীন হিন্দু-ধর্মীয় আদর্শ অব্যাহত রাখার জন্য নতুন নতুন সংগঠন কায়েম হয়। এগুলো সনাতন হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকে। এই সামাজিক পরিবেশে হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবনের প্রধান নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হিন্দু মধ্যশ্রেণীর কাছে হিন্দু ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার 'নব্য হিন্দুবাদ' প্রচারের মাধ্যমে সনাতন হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবনের যে কাজ শুরু করেছিলেন, বিবেকানন্দ তা বহুদূর এগিয়ে নেন। তার শিক্ষাকেই বর্ণহিন্দুরা তাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। এই জাতীয়তাবাদের মূল কথা ছিল :

> "স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ, হিন্দু আদর্শের পুনরুত্থান এবং ভারতীয় প্রাচীন আধ্যাত্মিক ধারণার সমষ্টিবদ্ধ রূপ"।

বিপিনচন্দ্র পালের মতো হিন্দু জাতীয়তাবাদের চরমপন্থি প্রবক্তাগণও বিবেকানন্দকেই তাদের রাজনৈতিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

১৯০১ সালে বিবেকানন্দ ঢাকা এলে তাঁর সাথে এখানকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের লোকদের ঘনিষ্ট আলোচনা হয়। সে আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং ভারতকে রাম-রাজত্বে পরিণত করার ব্যাপারে বল প্রয়োগের নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলেছেন :

> "..... প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া তরুণ বাংলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর-সাধনা এমনকি ভগবতগীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুঃসাহসিক নেশা– পৌরুষ, তেজস্বিতা, অর্থাৎ বীরনীতি দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য। ... হে বঙ্গের তরুণ দল, তোমরা ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈদের আদর্শ অনুসরণ কর।... জনগণের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুসরণ কর।" (ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বামী বিবেকানন্দ–পেট্রিয়ট এন্ড প্রফেট)

বিবেকানন্দ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

> "তথাকথিত সমাজবাদী স্বামীজির মতে ... ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনৈতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য এই ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দু ধর্মের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্তিত নব হিন্দুবাদেরই প্লাবন তা বলাই বাহুল্য।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২১৭)

১৮৫৩ সালে কলকাতায় অবিভক্ত বাংলার বনেদি হিন্দু জমিদারদের উদ্যোগে বেঙ্গল ল্যান্ডলর্ডস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এরপর কলকাতার বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী জমিদার ও বণিক শ্রেণীর উদ্যোগে তাদের স্বার্থ রক্ষার দুর্গরূপে ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এই সমিতির সকল সদস্য ছিলেন ইংরেজদের দ্বারা সদ্য-সৃষ্ট জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনিক গোষ্ঠীর লোক। অভিজাত ও জমিদার ছাড়া অন্যদের এই সমিতিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই সমিতির সদস্যরাই আইন সভার সদস্য হতেন। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এই সমিতির ৩ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য হয়েছেন। তাঁরাই দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও পেশা বিষয়ক স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এ বিষয়ে আব্দুল মওদুদ লিখেছেন :

> "তাদের মধ্যে ঠাকুর বংশই ছিল অগ্রগণ্য। বিশাল জমিদারি, বিপুল ব্যবসায় ও অফুরন্ত ধনসম্পদের অধিকারী হিসেবে এই বংশটির ঐতিহ্যে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা মুখরিত। প্রিন্স দ্বারকানাথের ভ্রাতা মহারাজা রমানাথ ঠাকুর এই সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন দশ বছর এবং ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার ও ১৮৭৩ সালে ভারতীয় বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী নেতা হিসেবে এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সভ্য হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সরকারি ও অন্যান্য সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও ১৮৬৩ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্য হন। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার ও ১৮৭৭ সালে ভারত বিধান সভার সভ্য হন। সামান্য বেনে-নন্দন রামগোপাল ঘোষ বাণিজ্যলব্ধ অর্থবলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স শিক্ষা সভার ১৮৪৫ সালে ও বঙ্গীয় বিধান সভার ১৮৬২ সালে সভ্য হন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উপরিউক্ত এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সভ্য এবং ব্রিটিশ সাহায্য ও অনুগ্রহ-ধন্য কলকাতার নব্য 'রইস'।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৬৮)

১৮৬৬ সালে কলকাতার বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও ইংরেজ রাজশক্তিকে মদদ যোগানোর লক্ষ্যে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' কায়েম হয়। এই সংস্থাটির অনুষ্ঠান-পত্রে 'হিন্দু ব্যায়াম', 'হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা' ও 'হিন্দু শাস্ত্র' অবলম্বনে সমাজ সংস্কার করার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের ভিত্তিতে ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল (বাংলা ১২৩৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে) বেলগাছিয়ায় ডানকান সাহেবের বাগানবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্শীবাদে জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রমুখের উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণহিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে আত্মনির্ভরশীল করা এই মেলার লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ বার এই মেলায় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু

মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াগুলো 'আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে' আদায়ের লক্ষ্যে পদচ্যুত প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা'।

১৮৮২ সালে ভারতীয় বিধান সভায় 'ইলবার্ট বিল' নামে একটি বিল পেশ হয়। এই বিলে বিধান ছিল, দেশীয় হাকিমদের কাছেও ইউরোপীয়দের বিচার হতে পারবে। ইউরোপীয়রা এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন অন্যায় জেনেও ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করে এবং বিলের উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। হিন্দু মধ্যবিত্তরা এই বিলের পক্ষে আন্দোলন করে। ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত জটিলতাকে কেন্দ্র করে ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স স্থাপিত হয়। অবশেষে ইংরেজ প্রাক্তন সিভিলিয়ান এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর উদ্যোগে এবং গভর্নর জেনারেল ডাফরিনের পরামর্শে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বে শহরে এক বৈঠকের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। এ বিষয়ে রজনী পাম দত্ত লিখেছেন :

> "প্রকৃতপক্ষে বড় লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধে শক্তি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার অস্ত্ররূপে।" (ইন্ডিয়া টুডে)

১৮৮৬ সালে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যশ্রেণী এভাবেই উনিশ শতকের আশির দশক নাগাদ একটি বিকশিত স্তরে উন্নীত হয়। আবদুল মওদুদ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> "এই আমলে আমরা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখেছি, পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যেসব উপহার এসেছে সে-সব তারাই উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, নতুন ভাবধারা গ্রহণ করে আত্মীকরণ করেছে এবং সম্প্রসারণও করেছে। সারা উপমহাদেশের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একত্রিত এবং সংহত করেছে। নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের একটা সাধারণ ভাষা দিয়েছে, সাধারণ ভাবধারা দিয়েছে এবং সাধারণ জ্ঞানও দিয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক ট্রাডিশনের পাশাপাশি। নতুন প্রেসও বহির্বিশ্বের ভাবধারা ও কর্মধারার সংস্পর্শে এনেছে এদেশবাসীকে এবং তার প্রতিক্রিয়াও সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাদ্রাজ দিল্লীর সঙ্গে যখন-তখন কথা বলছে, বোম্বাই বলছে কলকাতার সঙ্গে। এভাবে নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তনের পর ইলবার্ট বিল উপস্থাপিত হওয়ার সময় (১৮৮২) পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে হিন্দু সমাজ-দেহের মধ্যম স্তর থেকে এমন একটা সুসংহত একই স্বার্থডোরে জড়িত শ্রেণীর উদ্ভব হলো, যারা সর্বভারতে একই শিক্ষা, একই ভাবধারা ও একই মূল্যবোধ প্রবর্তিত করল নিজেদের গণ্ডির মধ্যে। অবশ্য এ

শ্রেণী ছিল বিরাট সমাজ-দেহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও তেজোদ্দীপ্ত ও বিস্ফোরণ-উন্মুখ। এটিকে বলা যায় হিন্দু ভারতের নতুন আত্মা এবং এই নতুন আত্মার মুখেই অতঃপর হিন্দু ভারতের প্রাণের বাণী শোনা যেত এবং সে বাণী সমগ্র হিন্দু জাতির অন্তরের কথা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করত।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩)

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু ও মারাঠা ব্রাহ্মণদের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের এক সেতুবন্ধ তৈরি হয়। মহারাষ্ট্রে স্থাপিত দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের সমর্থক মারাঠা ব্রাহ্মণ ও কলকাতার বর্ণহিন্দুরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর সাথে চরম বোঝাপড়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এ সময়। এম আর আখতার মুকুল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় এলাকার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা যখন দিনে স্যুট-প্যান্ট আর সন্ধ্যায় ধুতি, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের সেতুবন্ধ রচিত হলো। এই সম্প্রদায়ের চোখে তখন ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন।" (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)

কলকাতার বর্ণহিন্দুদের চিন্তা-ভাবনার স্তরে স্তরে এ সময় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা ডালপালা বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে ডক্টর পুলিন দাশ লিখেছেন :

"১৮৬৬ সালে ব্রাহ্ম সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও অপর অংশ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে চিহ্নিত হয়।...... দেবেন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক' বিখ্যাত বক্তৃতা দেন (১৮৭২)। 'বংগদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রাজনারায়ণের বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রকেও দেখা যায় হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়ন ও আলোচনায় নিবিষ্ট হতে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'প্রচার' পত্রিকা হিন্দু ধর্মের প্রচারমাধ্যম হয়ে ওঠে। দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ (১৮৭৫) আন্দোলন হিন্দু পুনরভ্যুত্থানে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বেদকে অভ্রান্ত গণ্য করে দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অতঃপর দয়ানন্দ প্রবর্তিত মতবাদের অনুপ্রেরণা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার'-এর সঙ্গে বাংলাদেশের আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে 'বংগবাসী', 'নবজীবনী' হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ..... বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আকৃষ্ট হন।

বঙ্গদেশের শিক্ষিত সাধারণের কাছে দয়ানন্দ পরিচিত হয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে। 'ইন্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রে প্রধানত কেশবচন্দ্রের রচনা-ধারার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমা প্রকাশ পেতে থাকে। হিন্দুর যে পৌত্তলিকতা নব্য শিক্ষিতদের দ্বারা সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়েছিল, রামকৃষ্ণ ছিলেন সেই পুতুল পূজারী। গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্র সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন মার্গী বহু গুণীজনের শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃষ্টান্তে পৌত্তলিক হিন্দুর আত্মপ্রসাদ লাভের যথেষ্ট সুযোগ মিলল।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক)

এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন :

"উনবিংশ শতাব্দীর আট দশকের সূচনায় হিন্দু পুনরুত্থানের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত চাতুর্যে এতদিন ধরে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আপ্লুত রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু ধর্মরূপী যে চারাবৃক্ষে জলসিঞ্চন করছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে কলিকাতায় সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে তার বিরাট মহীরুহ আকারের চেহারাটা সকলের দৃষ্টিগোচর হলো। আসলে এটাই হচ্ছে বঙ্গীয় এলাকার শতাব্দীকালের বিষবৃক্ষ। .... উনবিংশ শতাব্দীর আট দশকে কলিকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'উদার ও সংস্কারপন্থি মন-মানসিকতা' উচ্ছিষ্টের মতো নর্দমায় নিক্ষিপ্ত করেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে মেকলের ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে যুক্ত হলো 'সনাতন হিন্দু ধর্মের' শ্রেষ্ঠত্ব, আর 'হিন্দু বাহুবলের আবরণ।" (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু লেখকরা হিন্দু পুনর্জাগরণমূলক কবিতা, গান আর নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে রাজপুতদের সাথে মোগল বিরোধকে উপজীব্য করে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। লে. কর্নেল জেমস টড-এর রচিত 'এনাল্স এন্ড এন্টিক্স অব রাজস্থান' নামক বইটি ছিল শত বছর ধরে হিন্দু লেখকদের অবলম্বন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যে চারণ গীতিকে 'আফিমখোরদের গাল-গল্প' বলে অবহেলা করেছেন, টড-এর তা-ই ছিল উপজীব্য। মোগলদের সাথে রাজপুত জাতির আত্মরক্ষামূলক ও সমঝোতামূলক লড়াইকে ঘিরে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় মনে করে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে হিন্দু লেখকরা নযর ফেরালেন মারাঠা দস্যু 'পার্বত্য মুষিক' ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি। শিবাজীর ব্যক্তিত্ব, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী ও বীরগাঁথা অবলম্বনে এ সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর নেতৃত্ব নিলেন কংগ্রেসের

চরম দক্ষিণপন্থি নেতা মারাঠা-ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৩ সালে তিনি 'গণপতি উৎসব' প্রবর্তন করলেন। তার উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ১৮৯৬ সালের ১৫ এপ্রিল 'শিবাজী উৎসব'-এর আয়োজন করা হয়। এর পরের বছর পুনা শহরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে তিনদিনব্যাপী শিবাজী উৎসব পালিত হয়। তিলক ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবেরও প্রচলন করেন। শিবাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। তাই ভবানী পূজা শিবাজী উৎসবের মূল অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। মারাঠাদের অনুসরণে ১৯০২ সাল নাগাদ কলকাতায় শিবাজী উৎসবের সূচনা হলো। এর পরেই বাংলা সাহিত্য, নাটক, কবিতা আর গানগুলো ছত্রপতি শিবাজীর জয়গানে মুখরিত হলো। বাঙালিত্বের নামে হিন্দু বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু রিভাইভালিজম-এর মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু জাতীয়তা প্রতিষ্ঠাই ছিল তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রায় সকল বর্ণহিন্দুর অভিন্ন লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী 'দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক বাংলা নাটক' বইয়ে তখনকার অবস্থা চিত্রিত করে লিখেছেন :

> "মোগলের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংগ্রামের কাহিনী যেমন আমাদের দেশাত্মবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী। শিবাজীকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে উঠেছে। চার বছর ধরে শিবাজী উৎসব চলছিল কলকাতা শহরে। চরমপন্থি স্বাদেশিকরা বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হলো তার অঙ্গ স্বরূপ ছিল ভবানী পূজা। শিবাজী উৎসবে ভবানী মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শিবাজীকে 'জাতীয় বীর' রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল।"

৭.

বাংলায় জন-বিদ্রোহ

ইংরেজ কোম্পানি এবং তার এ দেশীয় দালাল শ্রেণীর সর্বাত্মক নিপীড়ন, নির্যাতন ও লুণ্ঠন-শোষণের মুখে বাংলার মুসলমানদের সামনে পথ ছিল দু'টি : অনিবার্য ধ্বংসের কাছে আত্মসমর্পণ; কিংবা বিদেশী দখলদার ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটরদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম। দ্বিতীয় পথটি ছিল মুসলমানদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত-পিচ্ছিল রাজপথে তাই শুরু হয় তাদের পথ চলা।

পলাশীর পতনের ছয় বছরের মাথায় ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহের সূচনা করেন ফকির মজনুশাহ। আযাদী পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির এই প্রথম গণসংগ্রাম ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। এ সময় থেকেই একের পর এক সংঘটিত হয় ত্রিপুরা জেলায় শমশের গাযীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপে আবু তোরাবের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে মোমেনশাহীতে গণজাগরণ (১৭৭৫), শের দৌলত খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখশ খাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম-চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৯), রংপুর-দিনাজপুরে নূরলদীনের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), ফকীর বোলাকী শাহের নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯২), মোমেনশাহী ও জাফরশাহী পরগণায় জমিদার-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), হাজী শরীয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ববাংলায় ফরায়েজী আন্দোলন (১৮১৮-৭০), উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অনুসারীদের জিহাদ আন্দোলন ও তিতুমীরের নেতৃত্বে জিহাদপন্থি কৃষক বিদ্রোহ (১৮২১-১৮৭০), সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭), সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), টিপু পাগলার নেতৃত্বে পাগলপন্থি গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-৮২) ইত্যাদি। লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায়, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশ' বছর পর্যন্ত মুসলমান মানেই ছিল 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা'।

ফকীর ও কৃষক বিদ্রোহ

পলাশীর বিপর্যয়ের ছয় বছরের মাথায় মীর কাসিমের নেতৃত্বে দেশীয় সৈন্যগণ যখন ১৭৬৩ সালে পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধরত, বাংলা ও বিহারের ইংরেজ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে সে সময় বিদ্রোহের ঝান্ডা তোলেন ফকীর মজনু শাহ্। বেতনভুক সৈনিকদের শক্তির ওপর ভরসা করে পরিচালিত মীর কাসিমের সংগ্রাম অল্প সময়ের মধ্যে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকীর বিদ্রোহ নামে পরিচালিত এদেশের প্রথম জন বিদ্রোহ প্রায় চার দশক ধরে অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয় এবং দেশের জনগণের মধ্যে অধিকার ও আযাদীর দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তোলে। মাত্র হাজার খানেক লোক নিয়ে মজনু শাহ বিদ্রোহের সূচনা করেন। কয়েক বছরে তাতে বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। জমিহারা-গৃহহারা নিরন্ন চাষী, দিন মজুর, শিল্প ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা থেকে বঞ্চিত কারিগর, বেকার তাঁতী, চাকুরীচ্যুত বুভুক্ষু সৈনিকসহ সকল স্তরের মানুষ শরীক হয় এই বিদ্রোহে। আযাদী পুনরুদ্ধার, ঈমানের হেফাযত এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণ মুক্তির এই সংগ্রাম ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশির ভাগ সময় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা ও মোমেনশাহী এবং মাঝে মধ্যে ঢাকা ও সিলেটে বিদ্রোহীদের অভিযান পরিচালিত হয়। একেকটি অভিযানে কখনো কখনো কয়েক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী অংশ নিতেন। মহাস্থান গড় ও মধুপুর গড় এক সময় বিদ্রোহীদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্র ছিল। ১৭৬৩ সালে ইংরেজদের ঢাকা কুঠি হামলার মধ্য দিয়ে এ বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কৃষক ও কারিগরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সমগ্র বাংলা ও বিহার কিছুদিনের মধ্যেই মহাবিদ্রোহের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই বিদ্রোহ সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ রাজত্বের জন্য এবং তাদের নব্যসৃষ্ট দালাল জমিদার গোষ্ঠীর জন্য মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা বিভিন্ন স্থানের ফকীর বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়। দালাল জমিদাররা তাদের এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীদের তৎপরতার ফলে কোন কোন অঞ্চলে রাজস্ব আদায় কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের কাচারী বারবার লুণ্ঠিত হয়। ফলে ঐসব স্থানে ইংরেজদের রাজস্ব ঘাটতি ও জমিদারদের অর্থসংকট দেখা দেয়। ইংরেজ ও মজনু শাহের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষকালে গ্রামবাসীরা অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং পলায়নপর ইংরেজ সৈন্যদের হত্যা করে তাদের অস্ত্র মুক্তি সংগ্রামীদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

১৭৮৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর মজনু শাহ ইংরেজ সেনাপতি ব্রেনানের সাথে এক যুদ্ধে আহত হন। এরপর ১৭৮৭ সালের মার্চ কিংবা মে মাসে তিনি ইনতেকাল করেন। মজনু

শাহ-এর আসল নাম ও প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত। ইংরেজদের চোখ এড়ানোর জন্যই তিনি মজনু (পাগল) শাহ নামের আশ্রয় নিয়েছেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তাঁর পরিচয় বাকের মুহাম্মদ বা নূরউদ্দীন বাকেরজঙ্গ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। মজনু শাহের প্রধান সাথীদের মধ্যে ছিলেন চেরাগ আলী শাহ, ফেরাগুল শাহ, সুবহানী শাহ, করম শাহ, মাদার বখশ, জরিফ শাহ, রমযান শাহ ও রওশন শাহ। মজনু শাহের মৃত্যুর পরও চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তাঁরা এই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফকীর বিদ্রোহের সমসাময়িককালে ১৭৬৭-৬৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় শমশের গাজী বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। ১৭৬৯ সালে সন্দ্বীপে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন আবু তোরাব। ১৭৭৫ সালে মোমেনশাহীর সুসংগ ও শেরপুর জমিদারী এলাকায় ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষীদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন শের দৌলত খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখশ খাঁ। ১৭৮৩ সালে দিনাজপুরে কোম্পানির ইজারাদার 'রাজা' দেবী সিংহ ও তার 'দেওয়ান' হরেরামের বিরুদ্ধে নূরুলদীনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় কৃষক বিদ্রোহ। ১৭৯২ সালে ফকীর বোলাকী শাহের নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জে কৃষকদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এভাবে একটির পর একটি গণবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পলাশী বিপর্যয়ের মসীলিপ্ত ইতিহাস রক্ত রঞ্জিত, গৌরবময়, উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।

১৭৯৮ সালে ফতেহ আলী টিপু মহীশূরের আযাদী হেফাযত করার জন্য যখন জীবন বাজী রেখে লড়াই করছিলেন এবং ইংরেজ শাসকদের জন্য এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় তখন মজনু শাহের অনুসারীগণও আযাদী সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। আর তখন ইংরেজদের এই বিপদের দিনে কলকাতাকেন্দ্রিক সদ্য বিকশিত বর্ণহিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীটি বিদেশী কোম্পানি শাসনের প্রতি তাদের প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা করে ইংরেজদের সন্ত্রস্ত মনে সাহস বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। ১৭৯৮ সালের ২৯ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত এরূপ একটি সভায় কলকাতার নব্যসৃষ্ট ধনিক গোষ্ঠীর প্রতিভূ গৌরচন্দ্র মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, গোপিমোহন ঠাকুর, কালিচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা এক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ও সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ১৭৯৯ সালে ৪ মে মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান দেশের আযাদীর জন্য শাহাদত বরণ করলেন। বাংলার পথে-প্রান্তরে তখনো ফকীর বিদ্রোহীগণ তাঁদের বিদ্রোহের ঝান্ডা উঁচ রেখেছেন। অন্যদিকে মহীশূর থেকে বিজয়ীর বেশে কর্ণওয়ালিস কলকাতায় ফিরে এলে শহরের নব্যসৃষ্ট বর্ণহিন্দু প্রধান ব্যক্তিরা তাকে বাংলা ও ফারসি ভাষায় মানপত্র দিয়ে বরণ করে নেয়।

ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ বছর ধরে বাংলার মুসলমানদের যেসব আপসহীন মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তার মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ও জিহাদ আন্দোলন ছিল সবচে ব্যাপক ও সুসংহত এবং বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারক। হাজী শরীয়তউল্লাহ্র (১৭৬৪-১৮৪০) নেতৃত্বে ১৮১৮ সালে পূর্ববাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা হয়। জিহাদ আন্দোলন ছিল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) ও তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল আযীযের (১৭৪৬-১৮৪৩) বিপ্লবী ভাবধারায় উৎসারিত। শাহ আবদুল আযীয খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনের প্রবীণদের মধ্যে তাঁর তিন ভাই শাহ্ রফিউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদির ও শাহ্ আবদুল গণী এবং তরুণদের মধ্যে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) শামিল ছিলেন। শাহ্ আবদুল আযীয শেষোক্ত তিনজন আলেমকে সামনে রেখেই উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী গঠন করেন। এর আগে তিনিই ১৮০৩ সালে ইংরেজ পদানত হিন্দুস্থানকে সর্বপ্রথম 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন এবং আযাদী পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদের আহবান প্রচার করেন। এই আন্দোলন 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' বা 'জিহাদ আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ১৮২১ সাল থেকে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সারা উপমহাদেশ জুড়ে।

জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের উৎসভূমি, সংগঠন-কাঠামো ও কর্মসূচিতে পার্থক্য ছিল। কিন্তু মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আচার-আচরণ, নীতি-প্রথা ইসলামের আলোকে পুনর্গঠন, তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিজাতীয় কুসংস্কার, কুপ্রথা ও বিদআত থেকে মুক্ত করা এবং ইসলামের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করার ব্যাপারে তাঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। জিহাদপন্থিগণ তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্য সকল শত্রুর বিরুদ্ধেও প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন। বাংলাদেশেই ইংরেজ শাসন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে এবং এখানেই বর্ণহিন্দু জমিদারদের জুলুম-শোষণ ব্যাপকতর ও গভীরতর হওয়ার কারণে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জীবনের অবক্ষয় ছিল সবচে' বেশি। ফরায়েজী নেতৃবৃন্দকে বাংলার মুসলমানদের সেই ক্ষতস্থানগুলোর পরিচর্যা করতেই অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির পরই তাঁরা সশস্ত্র লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ফরায়েজী নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক কর্মসূচি ছিল ফরয প্রতিষ্ঠা, শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন, তওবার আন্দোলন, মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার এবং বিধর্মীয় নাম, পোশাক ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জন, ধর্মের নামে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী নির্মূল, মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, সামাজিক ভেদ-বৈষম্য দূরীকরণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি ছিল জমিদার-মহাজন-নীলকরদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিকার, সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, ইংরেজদের হাত থেকে আযাদী পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইংরেজ কবলিত ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা, দেশ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জুমুআ ও ঈদের নামায বর্জন এবং মুক্ত স্বদেশে স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা। অল্পদিনের মধ্যেই শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে বারো হাজার কৃষক সংগঠিত হয়। ঢাকা, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালী, নদিয়া ও মোমেনশাহীতে তাঁর আন্দোলনের প্রভাব বেশি ছিল। সবচে বেশি প্রভাব ছিল কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে। এসব আন্দোলনের কারণে হিন্দু জমিদার-মহাজনরা ক্ষেপে যায়।

১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী যখন বালাকোটের প্রান্তরে এবং তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সে বছরই হাজী শরীয়তউল্লাহ পূর্ববাংলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সময় জিহাদ আন্দোলনের পূর্ব-ভারতীয় নেতা মওলানা ইনায়েত আলী (১৭৯৪-১৮৫৮) 'কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য' পল্লী বাংলার জনগণকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান এবং ইসলামের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ফরায়েজীগণ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে ব্যাপক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয় এক অভূতপূর্ব প্রজাবিপ্লব। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরায়েজী নেতাদের সংগ্রামের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। প্রজাদের জন্য 'পিতার দরদ' এবং অবিচারের বিরুদ্ধে 'মুজাহিদের তেজ' নিয়ে প্রতিপত্তিশালী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। শান্তিপূর্ণ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই তাঁরা প্রজাদের সংগঠিত শক্তিকে অস্ত্রবলে বলীয়ান করেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের কাছে অত্যাচারী জমিদাররা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র পুত্র দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ঘোষণা করেন : "সব মানুষ ভাই ভাই। পৃথিবী আল্লাহর : সৃষ্টি যার শাসনও চলবে তাঁর।" তাঁর স্লোগান ছিল : "লাঙ্গল যার, জমি তার", "সৃষ্টি যার, আইন তাঁর"। বস্তুত জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের বক্তব্যের মূল সুর ছিল অভিন্ন।

জিহাদ আন্দোলনের সাথে বাংলার জনগণ একেবারে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৮২১ সালে হজ্জ সফর উপলক্ষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী কলকাতায় আসেন। বাংলার ওলামায়ে কেরাম ও সচেতন জনগণের একটি বিরাট অংশ সে সময় সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে এসে জিহাদ আন্দোলনের বাইআত বা শপথ গ্রহণ করেন। তিতুমীর তাঁদের

অন্যতম ছিলেন। ১৮২৫ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের অংশীদার পাঁচ-ছয় হাজার মুজাহিদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই যোগ দিয়েছিলেন বাংলা থেকে। তাঁদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সীমান্ত প্রদেশে সাইয়েদ আহমেদ বেরেলভীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারের 'মজলিসে শূরা' বা মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন পূর্ববাংলার বিপ্লবী মুজাহিদ নেতা ইমামউদ্দিন বাঙালি। ১৮২৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের কঠিন সংকটকালে জনশক্তি ও আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশ থেকেই প্রথম গিয়ে পৌঁছেছিল। জিহাদ আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল রাখার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় মা-বোনেরা তাঁদের অলংকার এবং অনেকে তাঁদের গরু-বাছুর বা জমি বিক্রি করে জিহাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন। ১৮৩১ সালে ৬ মে বালাকোটের প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও মওলানা শাহ ইসমাঈল-এর সাথে দুই শতাধিক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় অন্তত নয়জন বাঙালি মুসলমানের নাম এ পর্যন্ত জানা গেছে। ইমামউদ্দীন বাঙালিসহ বাংলার প্রায় চল্লিশ জন মুজাহিদ বালাকোটের লড়াইয়ে আহত হন। বালাকোট-এর ময়দান থেকে ফিরে এসে তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন।

এই সময় বাংলার জিহাদ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকার বংশালে। পাটনা ছিল মূল কেন্দ্র। ফরায়েজী আন্দোলনের বেশি প্রভাব ছিল মোমেনশাহী থেকে বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে। আর জিহাদ আন্দোলন বেশি শক্তিশালী ছিল উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে। ফলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে সে সময় ইংরেজ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে এই দু'টি আন্দোলনের মিলিত প্রভাব বাংলার প্রায় সবটা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বাইরে থেকে অনেকের চোখেই এই দু'টি আন্দোলনের পার্থক্য ধরা পড়তো না। উভয় আন্দোলনকে ইংরেজ ও তাদের সমর্থকরা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে চিহ্নিত করত।

জিহাদপন্থি তিতুমীরের লড়াই

মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ১৮২১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর সাথে সাক্ষাত এবং মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে তিনি সাইয়েদ সাহেবের একজন খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় জিহাদ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্র ফরায়েজী আন্দোলনের সমসাময়িককালে পরিচালিত তিতুমীরের আন্দোলনের সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন। মারাঠা-বর্গীদের দ্বারা লুণ্ঠিত পশ্চিমবাংলায় হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা নিষ্পেষিত জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের ওপর কায়েম হয়েছিল হিন্দুদের

সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তহবন্দ-এর পরিবর্তে ধুতি, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলমানী নাম রাখতে জমিদারের পূর্বানুমতি ও খারিজানা, হিন্দুদের পূজার জন্য পাঁঠা যোগানো ও চাঁদা দেওয়া, দাড়ির ওপর ট্যাক্স, মসজিদ তৈরি করলে নজরানা, গরু জবাই করলে ডান হাত কেটে নেওয়া প্রভৃতি জুলুম ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। এই পটভূমিতেই জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত মওলানা তিতুমীর কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করে তিনি জনগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ পূর্ণরূপে অনুসরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণায় তিনি সকলকে উজ্জীবিত করেন। বিরান হয়ে যাওয়া মসজিদসমূহ তিনি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রচলন করেন। তিনি পূজার চাঁদা দান বা তাতে অংশগ্রহণের মতো কাজ বন্ধ করেন। শিরক-বিদআত বন্ধ করেন। মুসলমানী নাম রাখা, ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, পীরপূজা ও কবরপূজা বন্ধ করা, কুসংস্কার ও অনৈসলামী কাজের মূলোচ্ছেদ তথা কুরআন-হাদীসের খেলাফ কোন কাজ না করা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনে তাঁর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

তিতুমীরের আন্দোলনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানগণ এবং বহু অমুসলমান কৃষক দ্রুত জোটবদ্ধ হলেন। তিতুমীরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক বিরাট ইসলামী জামাত। তিতুমীরের সংগ্রাম ছিল জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর শ্লোগান ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'। তাঁর বক্তব্য ছিল 'প্রত্যেকের শ্রমের ফসল তাকে ভোগ করতে দিতে হবে।'

এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রীদেবনাথ রায়, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার শ্রীরায়বল্লভ, তারাবুনিয়ার জমিদার শ্রীরামনারায়ণ নাগ, নাগরপুরের জমিদার শ্রীগৌরপ্রসাদ চৌধুরী, সরফরাজপুরের জমিদার শ্রী কে পি মুখার্জী ও কলকাতার গোমস্তা লাটু বাবুরা ঐক্যবদ্ধ হয়। ইংরেজ নীলকররাও ছিল তাদের পক্ষের শক্তি। একদিকে তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন, অন্যদিকে জমিদারদের জুলুমের মাত্রা বাড়ছিল তীব্র গতিতে। তিতুমীরের একজন পত্র-বাহককে পুঁড়ার জমিদার নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। জমিদারের লোকেরা বশিরহাটের জামে মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। মুসলমাদের ঘরবাড়ি তারা লুট করে। এভাবেই একটির পর একটি ঘটনা ঘটতে থাকে।

এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মুসলমানগণ তিতুমীরের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়াতে থাকেন নানা জায়গায়। এরূপ পটভূমিতে তিতুমীরের বাহিনীর সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নারিকেলবাড়িয়ার এক বিরান মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রতিরোধের দুর্গ। গড়ে ওঠে বাঁশের কেল্লা। তিতুমীরের বাহিনী নদিয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার

অধিকাংশ ভূখণ্ড মুক্ত করে। এই সীমিত ভূখণ্ডে কার্যত মুসলমানদের স্বরাজ কায়েম হয়। এভাবেই তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন মাতৃভূমি আযাদ করার রক্ত-পিচ্ছিলপথে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে জমিদার ও ইংরেজদের পরাজয় হয়।

এরপর পূর্ণাঙ্গ লড়াই। বড়লাট লর্ড ব্যান্টিঙ্কের নির্দেশে ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ড, ক্যাপ্টেন শেক্সপীয়রসহ ইংরেজদের অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী হামলা চালায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। ১৯ নভেম্বর ফযরের নামাযের পর তিতুমীর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বী ভাষায় অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি জাতির ঈমান, অধিকার ও আযাদী রক্ষার সংগ্রামে শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য তাদেরকে বুলন্দ আওয়াজে আহ্বান জানালেন।

যুদ্ধ শুরুর আগে ইংরেজ সেনাপতি ও তিতুমীরের মধ্যে রামচন্দ্র নামক একজন দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা হয়। দোভাষী উভয় পক্ষের বক্তব্য বিকৃতভাবে পরিবেশন করে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীর, তাঁর পুত্র মীর জওহর আলী ও আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ময়েজউদ্দীন বিশ্বাসসহ বহু যোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। তিতুমীরের দুই পুত্র মীর তোরাব আলী ও মীর গওহার আলী এবং সেনাপতির ভাগ্নে গোলাম মাসুমসহ বন্দী হন সাড়ে তিন শত মুক্তিযোদ্ধা। গোলাম মাসুমকে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলা হলে তিনি ঘৃণার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেল্লার পুব পাশে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজ সেনাপতি মেজর স্কট মন্তব্য করেছেন :

> "যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, কিন্তু জীবন দিয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ।"

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব

পলাশী বিপর্যয়ের ঠিক একশ' বছর পর ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। শত বছর ধরে এদেশের আযাদী পাগল মুসলমানরা যে নিরন্তর বিদ্রোহ পরিচালনা করে 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা' অভিধা লাভ করেছিলেন, সিপাহী বিপ্লব নামে পরিচিত আযাদীর লড়াই ছিল তারই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কগণই ছিলেন সিপাহী বিপ্লবের মূল শক্তি ও অনুপ্রেরণা। ১৮৩১ সালে বালাকোটে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর বাহিনীর বিপর্যয়ের পর জিহাদের বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জীবিত নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমের

অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অন্যতম অনুসারী হাফিয কাসিম।

জিহাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনারেল বখত খান, মওলানা আহমদ উল্লাহ শাহ ও মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী দিল্লী কেন্দ্রে, হাজী ইমদাদউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীগণ শামেলী, সাহারানপুর ও থানাভবনে সক্রিয় ছিলেন। হাফিয কাসিমের অনুসারী নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের মধ্যে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসিম নানুতুভী, মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী, মওলানা মোহাম্মদ মুনীর প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও কানপুরসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে এক সুগ্রন্থিত যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল।

জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক মওলানা আহমদউল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৬৫ সাল থেকেই বিপ্লব ও বিদ্রোহের সংকেতবাহী চাপাতি রুটি ও রক্তজবা ফুল বিতরণ শুরু হয়ে যায়। এক গ্রামের নেতার হাত থেকে দ্রুত অন্য নেতার হাতে ঘুরছিল বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী চাপাতি রুটি। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন রক্ত-রঙিন আযাদী বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী জবা ফুল। সে কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সবখানে বিপ্লবীদের কার্যক্রমের খবর প্রতিদিনই সতর্কতার সাথে পৌঁছে যাচ্ছিল।

১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা আহমদউল্লাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারপত্র বিলির অপরাধ প্রমাণ করে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়। তার আগে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করেন। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারিতে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন :

> "দেশবাসী, আপনারা জেগে উঠুন। ফিরিঙ্গি কাফেরদের উৎখাত করতে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। এই কাফেররা ন্যায়কে পদদলিত করেছে, আমাদের স্বরাজ্য তারা লুণ্ঠন করেছে। এই কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সে সংগ্রাম হবে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য জিহাদ।"

জিহাদ আন্দোলনের অসংখ্য বিপ্লবী নেতা এ সময় হিন্দুস্থানের প্রত্যন্ত এলাকায় এমনিভাবে দেশবাসীকে আযাদী পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরও জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রাম দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এ সময় এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

১৮৫৭ সালে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের রাজধানী কলকাতার ব্যারাকপুরে। বাংলায় সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, যশোর প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার বিদ্রোহ চলাকালে একজন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও চারজন আহত হয়। অন্য দিকে ৪০ জন দেশীয় সিপাহীসহ বহু আহত হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য ১৮৫৭ সালে লালবাগের যে স্থানটিতে সেদিন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্ত ঝরেছিল, সে স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য ইংরেজরা সেখানে কারাগার নির্মাণ করে, যা এখনো বিদ্যমান। ইংরেজদের হাতে বন্দী বিপ্লবী মুসলমান সিপাহীদের ষাট জনকে সদরঘাটের অদূরে 'আন্টাঘর ময়দানে' গাছের শাখায় ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁদের লাশ মাসের পর মাস সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবকামী জনগণকে আতঙ্কিত করার জন্য। সেই আন্টাঘর ময়দানই এখন 'বাহাদুর শাহ পার্ক' নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি স্মৃতির মিনাররূপে তা আজো আমাদের পূর্বপুরুষদের মহান আত্মদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরেজরা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে এ জন্য যে, তাঁর আহ্বানে যে কোন মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার লোক সাড়া দিতে এবং তিনি তাদেরকে যা আদেশ দেবেন, তারা তাই করতে প্রস্তুত ছিল।

১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে বিকৃত করার চেষ্টা করা হলেও এই বিদ্রোহের পেছনে আযাদী পাগল বেসামরিক মুসলিম বিপ্লবীদের ভূমিকাই মুখ্য ছিল। একথা কোন কোন ইংরেজ লেখকও স্বীকার করেছেন। স্যার জেমস আউটরামের মতেও বিপ্লবী মুসলমানগণই ছিলেন এই বিদ্রোহের মূল শক্তি। বিদ্রোহ দমনের কাজে নিয়োজিত দু'জন ইংরেজ সৈন্য ১৮৫৭ সালে বেনামীতে লেখা বিদ্রোহের ইতিহাস বইয়ে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীকে এই ঘটনার সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁরা লিখেছেন :

> "রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় নির্বাসিত হন এবং তিনি ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের উপায় তালাশ করতে থাকেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সৈন্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি চেষ্টা চালাতে থাকেন। অযোধ্যার নবাবের সভাসদ ও অনুচরগণ সন্দেহাতীতভাবে এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিলেন।"

১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজরা জনগণের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করে। বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ কতজনের যে ফাঁসি হলো, কত লোকের হলো কারাবাস, সে হিসাব পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিতদের সংখ্যাই ছিল দশ হাজারের বেশি।

জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক আন্দামান-বন্দী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন :

"স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন একজন মুসলমানও সে দিন বাঁচেনি।"

আপসহীন বিপ্লবী ধারার অবসান

সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের নেতা মওলানা ইনায়েত আলী এবং ১৮৬২ সালে ফরায়েজী আন্দোলনের নায়ক দুদু মিয়া ইনতেকাল করেন। বিপ্লবোত্তর ব্যাপক মুসলিম নির্যাতনের পটভূমিতে এবং আন্দোলনের দুই প্রধান কান্ডারীর ইনতেকালের পর এই দু'টি আন্দোলনের ধারা কিছুটা দুর্বলভাবে হলেও আরো বহু দিন অব্যাহত থাকে। ১৮৬৬ সালে জিহাদী বিপ্লবীগণের উদ্যোগে তাঁদের আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটিরূপে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই জিহাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। অন্যদিকে দুদু মিয়ার পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দার ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এবং আবদুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এ সময়ও ফরায়েজী আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত তথাকথিত 'ওয়াহাবী মামলাগুলো থেকে জানা যায় যে, সে সময় পর্যন্ত বাংলায় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ধারা চালু ছিল। এ সময়ও বিভিন্ন গ্রামে ফরায়েজীদের একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন এবং বিচার-ফয়সালা থেকে শুরু করে জনগণের শাসনকার্যের বিরাট অংশ তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯০১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখানো হয়েছে যে, বগুড়ায় ফরায়েজীরা তখনো সক্রিয়। সরকারবিরোধী জিহাদের জন্য তাঁরা চাঁদা তুলতেন এবং প্রতিটি ফরায়েজী পরিবারে জিহাদের জন্য মুষ্টি-চাল রাখা হতো।

নয়া মিয়ার পুত্র খান বাহাদুর সাঈদউদ্দীন আহমদ ১৮৮৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এবং এর পর তাঁর পুত্র আবু খালিদ রাশিদউদ্দিন ওরফে বাদশাহ মিয়া (মৃ. ১৯৫১) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সাঈদউদ্দীন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। বাদশাহ মিয়া খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেন।

৮.

বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ

'ভেতর থেকে সংস্কার'

সিপাহী বিপ্লবোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইঙ্গ-হিন্দু দ্বিমুখী সাঁড়াশী হামলার শিকার মুসলমানদের আপসহীন মুক্তিসংগ্রামের জিহাদী কাফেলা বহু আত্মদান সত্ত্বেও ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। এই নতুন প্রেক্ষাপটে ধ্বংসোন্মুখ মুসলমানদের রক্ষার জন্য নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল ফরিদপুরের নওয়াব আবদুল লতিফ কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠন করেন। ১৮৬৪ সালে সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি'। এটি পরে 'আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' নাম ধারণ করে। ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী কায়েম করেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'।

জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা কারামত আলী জৌনপুরীও এ সময় ধ্বংসোন্মুখ মুসলমানদেরকে আপসহীন সশস্ত্র লড়াই থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে 'ভেতর থেকে সংস্কার' তথা অন্তর্বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র এক সভামঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইংরেজ কবলিত ভারত 'দারুল হরব' নয়।

তাঁর এই ফতওয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে বাহাস-বিতর্ক জিইয়ে রাখলেও ১৮৭০ সালে কার্যত মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের ইংরেজবিরোধী আপসহীন রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় বাংলার সনাতনপন্থি এবং জিহাদী ও ফরায়েজীদের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায় জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-৯৭) 'প্যান ইসলামবাদ' বিশেষ অবদান রাখে।

নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজদের সাথে নমনীয় নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে অধঃপতিত মুসলমানদের অধিকার ও ন্যায্য হিস্যা

আদায়ের নীতিগ্রহণ করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রবল জোয়ারের বিপরীত ধারায় দাঁড়িয়ে এই তিন কান্ডারীর নেতৃত্বেই এ সময় বিপর্যস্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। মুসলমানদের স্বকীয় সত্তা, তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র প্রেরণাকে উপজীব্য করে মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে শিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারগুলো আলেম সমাজের আন্দোলনমুখী কার্যক্রমের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা নতুনভাবে সংগঠিত এই আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত ও সংগঠিত করার এবং হিন্দু এলিটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার এক সম্ভাবনাময় শক্তির সন্ধান পান। ঢাকা, কলকাতা, হুগলী ও চট্টগ্রামের সদ্য প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসা গ্র্যাজুয়েটগণ এবং দেওবন্দী আলেমগণ বাংলার মুসলিম গণজাগরণে এ সময় মুখ্য ভূমিকায় এগিয়ে আসতে থাকেন।

এ সময় মুসলমানদের বহু নতুন মাদরাসা গড়ে ওঠে এবং আলেমগণ ধর্মীয় পুস্তক রচনা ও মাহফিলে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। নসিহতনামা জাতীয় বই-পুস্তক ছাড়াও প্রকাশিত হতে থাকে জাতীয় জাগরণমূলক বইপত্র। খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতা মোকাবিলার জন্য 'ইসলাম মিশন ফান্ড' গঠন করা হয়। এ সময় বিশেষত ফুরফুরার পীর সাহেবের অনুপ্রেরণায় মুসলমানদের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী যশোরের মুনশী মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) বইপত্র রচনা, সংগঠন কায়েম, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং বিশেষভাবে এদেশে শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশরূপে ওয়াজ মাহফিলকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে প্রচারক ও রাজনীতিকদের কাছে এই মাহফিল সম্মেলনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ চমৎকার জনসংযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষায় পশ্চাতপদ জনগণের কাছে আন্দোলনের বাণী দ্রুত পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিভিন্ন আঞ্জুমান ও মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবে মুসলিম সমাজ সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে আত্ম পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে ক্রমশ জাতিগত ঐক্য-চেতনা দানা বেঁধে ওঠে। ড. রফিউদ্দীন আহমদের ভাষায় :

> "By 1905 the building blocks which eventually went into the making of Pakistan were already there." (The Bengal Muslims, 1871-1906)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> "বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের সত্যিকার চেষ্টা হয় সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় যাঁদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সমাজপ্রাণ ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী হচ্ছেন মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজউদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। বাংলার মুসলমানের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ এঁদের প্রাণে একটা তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করছিল। এঁরা বুঝতে পারেন, বাংলার মুসলমানের অভাব-অভিযোগ, দুখ-বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র। এঁদেরই চেষ্টায় 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়। মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক পদে বরিত হন।" (দৃষ্টিকোণ, পৃষ্ঠা ১৬৯)

এই উদ্ধৃতি থেকেই তখনকার দিনে মুসলমানদের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং সাধ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আন্দায করা যায়। এর আগে বাংলার মুসলমানদের বাংলা-ফারসি দ্বি-ভাষিক প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালের মার্চ মাসে, স্বল্পকালের জন্য। সময়ের বিস্তর ব্যবধানে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় উর্দু-বাংলা দ্বি-ভাষিক সাময়িকপত্র 'মোহাম্মদী আখবার'। ১৮৭৪ সালে বাংলা সাময়িকপত্র 'আজিজন নেহার', ১৮৮১ সালে 'নব সুধাকর', ১৮৮৪ সালে 'মুসলমান', ১৮৮৫ সালে 'মুসলমান বন্ধু' ও 'ইসলাম', ১৮৮৬ সালে 'আহমদী', প্রকাশিত হয়। এসবই ছিল অত্যন্ত স্বল্পায়ু পত্রিকা।

১৮৮৯ সালে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' প্রকাশের পর ১৮৯০ সালে মীর মশারফ হোসেন প্রকাশ করেন পাক্ষিক 'হিতকরী'। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় 'ইসলাম প্রচারক', ১৮৯২ সালে 'মিহির' ও 'হাফেজ'। ১৮৯৪ সালে শেখ আবদুর রহীমের 'মিহির' এবং শেখ মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ-এর 'সুধাকর' যুক্ত হয়ে যৌথ সম্পাদনায় 'মিহির ও সুধাকর' নামে ১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে 'কোহিনূর', ১৮৯৯ সালে 'ইসলাম', ১৯০০ সালে 'নূর অল ইমান', ১৯০১ সালে 'মুসলমান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এভাবে বাংলা চৌদ্দ শতকের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই বলা চলে বাংলার মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। এরপর বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকার জন্ম হয়। এ সময় থেকে কুড়ি শতকের ত্রিশের দশকের ভিতর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'সওগাত' এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'মোহাম্মদী' স্থায়িত্ব ও ভূমিকার

বলিষ্ঠতার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অধঃপতিত মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন তথা বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণ ছিল এ সময়কার সকল পত্র-পত্রিকার মূল কথা।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে প্যান-ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকা। সাধারণভাবে মুসলমানদের মাঝে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার, ইসলামী আন্তর্জাতিকতা বা উম্মাহ-ধারণার প্রচার, তুর্কী খিলাফতের প্রতি আনুগত্য, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম অবদানের মহিমা প্রচার, ইংরেজ ও বর্ণ-হিন্দুদের প্রচার মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যর অবমূল্যায়ন করে প্রকাশিত রচনাবলীর জবাব দান, মুসলিম সমাজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান, শিরক-বিদআত-কুসংস্কার দূর করে শরীআতের অনুশাসনের ভিত্তিতে সকল প্রকার আলস্য ও জড়তা কাটিয়ে নতুন হিম্মতে জেগে ওঠার আহবান প্রচার প্রভৃতি বিষয় ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার প্রধান উপজীব্য। বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং নিজস্ব তাহযীব-তমদ্দুনের বিকাশ সাধন ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার একটি সুচিহ্নিত বিশেষ লক্ষ্য। এমনকি পরবর্তীকালের 'শিখা', 'সাম্যবাদী', 'জয়তী' প্রভৃতি পত্রিকার অন্তরের বাণীও ছিল মুসলিম সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা। তাদের বক্তব্যও ছিল ইসলামের সাথে সঙ্গতি-সন্ধানে প্রয়াসী।

তৎকালীন মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র সম্পর্কে ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

> "যে চেতনা ইতিহাস চর্চার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, সমাজ সংস্কার চেষ্টার মূলে প্রেরণাস্বরূপ ছিল, তুরস্কের প্রতি অসামান্য প্রীতির উদ্বোধন করেছিল, সে চেতনা স্বভাবতই এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করেছিল।" (মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃষ্ঠা ৪০)

মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম দশকগুলোতে সাংবাদিকতার সাথে যারা যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা মূলত সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও সংস্কৃতিসেবী। অধঃপতিত অনগ্রসর মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ্য করে সমাজ সংস্কার এবং মুসলিম জাগরণ ও স্বাধীনতার প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা এ কঠিন সাধনায় অংশ নিয়েছেন। তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। জাতির প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ তাঁদেরকে আর্থিক অনটনের মধ্যে পত্রিকার একেকটি সংখ্যা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁরা সকলেই যে যুগান্তকারী সৃজনধর্মী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এমনও নয়। স্ব-সমাজের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও সহমর্মিতা এবং অধঃপতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণাই সংবাদপত্রের সেবায় নিয়োজিত হতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পেশাদারী সাংবাদিকতা কিংবা সংবাদপত্রকে শিল্পরূপে বিকশিত করার ধারণাও তখন সৃষ্টি হয়নি। সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তাদের জীবন-মিশন ছিল কর্দমে প্রোথিত মুসলিম জাতির জাগরণ। সেকালের অন্য

সকল মুসলিম সাহিত্যিকের প্রবন্ধ রচনার মূলেও কাজ করেছে এই অভিন্ন প্রেরণা।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের এই বাধা-সংকুল পথ ধরেই দুই দশক পর ১৯০৯ সালে আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সম্পাদনায় মুসলিম বাঙলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'হাবলুল মতীন' প্রকাশিত হয়। মুফাফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম ও ফজলুল হক সেলবর্ষী ১৯১৯ সালে প্রকাশ করেন 'নবযুগ'। এর পর দৈনিক সেবক, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক সুলতান, দৈনিক তরক্কী, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক কৃষক মুসলিম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার মধ্যে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ' ছাড়া সবকটি দৈনিক সংবাদপত্রই ছিল স্বল্পস্থায়ী। আজাদ থেকেই বাংলায় মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন :

> "মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম নিঃসন্দেহে বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পাইওনীয়র, কিন্তু সংবাদপত্রকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং তার মারফতে মুসলিম বাংলাকে চিন্তার খোরাক যোগাতে শুরু করেন প্রধানত মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মওলবী মুজীবুর রহমান। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মওলবী মুজীবুর রহমান মুসলিম সাংবাদিকতাকে শুধু যে চিন্তা, আদর্শ-নিষ্ঠা ও নির্ভিকতায় মণ্ডিত করেন, তা নয়, তাঁরা একে বাংলায় শ্রদ্ধেয় করে তোলেন। বাংলার সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে কারুর পক্ষেই মুসলমানদেরকে যে আর উপেক্ষা করার উপায় নাই, এঁদেরই সাধনায় তা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠল।" (দৃষ্টিকোণ, পৃষ্ঠা ১৭৪)

জাতিগত ঐক্য-চেতনার জন্য

উনিশ শতকের শেষ ও কুড়ি শতকের প্রথম বছরগুলোতে আলেম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম জাগরণের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলেম সমাজের সাথে নব্য শিক্ষিত মুসলমানগণ ধর্মীয় সংস্কার ও মুসলমানদের সামাজিক জাগরণ প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এই সময়ের মুসলমানদের জাগরণ প্রয়াসের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

ক. মুসলিম সমাজে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিরোধ ও বাহাস-বিতণ্ডা প্রশমিত হয় এবং পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

খ. গ্রামীণ মুসলমানগণ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগধারায় মিলিত হতে শুরু করেন।

গ. মুসলমানদের রাজনৈতিক ও দীনী সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বহু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ সংগঠন ও আঞ্জুমান কায়েম হয়।

ঘ. বিপুলসংখ্যক নসিহতমূলক, ধর্মীয় সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও ঐতিহ্যধর্মী, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরবমূলক এবং জাতিসত্তা-উদ্দীপক বই-পত্র রচিত ও প্রকাশিত হয়।

ঙ. মুসলমানদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরার জন্য বাংলা ভাষায় এ সময় মুসলিম সম্পাদিত অনেক পত্র–পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

চ. এ সময়ই শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সম্মেলনরূপে ওয়াজ মাহফিল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করতে এসব মাহফিল অবদান রাখে।

তখনকার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংঘাত ও বিরোধের বহু উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের দু'টি ধারা জাতিগত ঐক্যচেতনার ভিত্তিতে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত হতে শুরু করে। ১৯০৫ সালের মধ্যে তা একটি পরিণত পর্যায়ে উপনীত হয়।

৯.

বঙ্গভঙ্গ : দুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সংঘাত

১৬৯৮ সালে সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর– এই তিনটি মাত্র গ্রামের জমিদারীর ইজারা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে সেই ইংরেজদের শাসনাধীন বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী এক বিশাল আয়তন লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে মধ্য-ভারতের একাংশ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পুবে চট্টগ্রামের সমুদ্র-সৈকত পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৭৭৩ সালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সনদ ২০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এই সময়ই প্রথমবারের মতো চার জন কাউন্সিলরসহ একটি গভর্নর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত-সাম্রাজ্য বিষয়ক প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক সনদ শেষবারের মতো ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য নবায়ন করা হয়। প্রশাসনিক চার্টার নবায়নের এই মুহূর্তে একটি ডেপুটি গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।

১৮০৩ সাল নাগাদ আধুনিক উত্তর প্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা ইংরেজদের দখলে চলে যায়। তখন এ প্রদেশের নাম করা হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। ১৮১০ সালের মধ্যে দিল্লী ও শিখ-সীমান্ত পর্যন্ত ইংরেজ-দখলের ব্যাপ্তি ঘটে। ১৮১৬ সালে নেপাল ও ছোট নাগপুর এবং ১৮১৭ সালে মধ্য-ভারতের মারাঠা অধিকৃত এলাকা ইংরেজরা গ্রাস করে। বেঙ্গলের অধীনে এই নবগঠিত এলাকা সাগর ও নর্মদা অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হয়। ১৮২৪ সালে আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মনিপুর এবং বিশাল বর্মী এলাকা ইংরেজরা দখল করে। প্রশাসনিকভাবে এই বিশাল ভূখণ্ডের পুরোটা ছিল বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর অধীন। ১৮৩৩ সালের সনদ অনুযায়ী আগ্রাকে রাজধানী করে একজন লেফটেন্যান্ট গর্ভনর-এর অধীনে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী স্থাপন করা হয়। বাংলা এ সময় মোগল বাদশাহী আমলের সাবেক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সুবাহসমূহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৩৯-৪০ সাল নাগাদ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

ইংরেজ রাজত্ব ফুলে-ফেঁপে ওঠার সাথে সাথে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার মোকাবিলার জন্য ১৮৫৩ সালে স্থায়ীভাবে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীন করা হয়। এই দুই প্রশাসনিক প্রধানেরই দফতর ছিল কলকাতায়। ১৮৬২ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী কলকাতায় একটি মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা হয়। এ বছরই কলকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী'র আয়তন ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গমাইল। পুব থেকে পশ্চিমে চিহ্নিত সীমানার দূরত্ব ৮০০ মাইল। (এম কে ইউ মোল্লা : দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, পৃষ্ঠা ১৫)

ইংরেজ প্রশাসনে তখন এক বেসামাল অবস্থা বিরাজ করছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার ৬টি জেলায়, বিহারের কিছু এলাকায় ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষে কয়েক লাখ মানুষ মারা যায়। দুর্ভিক্ষের জন্য দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোকে দায়ী করা হচ্ছিল। এ সময় থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বের মতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী এলাকার জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর-এর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ প্রস্তাবের সমর্থকরা ইংল্যান্ডে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, ব্রিটিশ ভারতে গভর্নর জেনারেল-এর অফিস কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কূটনীতি বিষয়ক কাজের অস্বাভাবিক চাপের দরুন গভর্নর জেনারেলের পক্ষে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর নিয়োগ অপরিহার্য।

১৮৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে আসামের কিছু ঘটনা ইংরেজ শাসকদের বিব্রত করে তোলে। ১৮৬৭-৬৮ সালে নাগা উপজাতির লোকেরা আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েক দফা হামলা চালায়। ১৮৭০-৭১ সালে তারা সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হামলা ও লুটপাট করে। আসামের চা বাগানগুলোতে উপর্যুপরি তাদের হামলা চলতে থাকে। এসব ঘটনার কারণে ১৮৭৪ সালে সিলেট জেলা ও আসামকে যুক্ত করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আলাদা প্রদেশ করা হয়। এর প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন চীফ কমিশনারের হাতে ন্যস্ত হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ছিল ৪১ হাজার ৭৯৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪১ লাখ। এর ফলে বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আওতায় থাকল। আসাম-বিযুক্ত অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ২ লাখ ৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ। ১৮৯৮ সাল নাগাদ লুসাই হিলস এলাকা বেঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অধীনে দেওয়া হয়। তারপরও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বিরাট বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল।

১৮৯৬ সালের ২৫ নভেম্বর আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সচিবের কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি আসামের সাথে ঢাকা, মোমেনশাহী ও চট্টগ্রাম এলাকা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আসামের জন্য একটি পৃথক সিভিল সার্ভিস গঠন ছাড়াও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত প্রদেশটি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে। সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশের আয়তন হবে ৮০ হাজার ৯৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা থাকবে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৮০ হাজার। (এম কে ইউ মোল্লা : দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম)

আসাম প্রদেশের এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে আরো আগে থেকেই আলোচনা চলছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা প্রশ্নে কলকাতার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৮৯২ সালের ৯ এপ্রিল এবং ঢাকা গেজেট-এ ১৮ এপ্রিল মন্তব্য করা হয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আর কোন এলাকা পৃথক করার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়। তখনও অন্য কোন এলাকার বিষয় আলোচিত হয়নি। 'ভারত সভা'র সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৮৯৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদ-লিপি দেন। সবশেষে আসামের চীফ কমিশনারের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব কলকাতার বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আসামের ভূমি-ব্যবস্থার কারণেই কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের কাছে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

১৮৯৬ সালের দিকে আসামের চীফ কমিশনারের দায়িত্ব পেলেন স্যার হেনরী জন স্টেড কটন। তিনি ছিলেন কলকাতার বর্ণহিন্দু স্বার্থের কট্টর সমর্থক। বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও মধ্যশ্রেণীর প্রিয় মানুষ কটন ১৯০২ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ছয় বছর দায়িত্বে থাকাকালে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, স্যার কটন অবসর নিয়ে কলকাতায় বসবাস করার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০৪ সালে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের সমর্থনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি জোর গলায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছেন, হিন্দুদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমর্থন করেছেন এবং বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত আনন্দও প্রকাশ করেছেন। ত্রিশ বছরের বেশি সময় এদেশে থাকার পর স্বদেশে ফিরে লন্ডনের উদারনৈতিক দলের টিকিটে এমপি হয়ে কটন বিলাতের পার্লামেন্টে কংগ্রেসের প্রতিটি কাজ নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। তাঁর বিবেচনায় কংগ্রেস ছিল একমাত্র সঙ্গত 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান আর মুসলিম লীগ একটি 'সাম্প্রদায়িক' দল।

ভারতীয় রাজনীতিতে এ সময় ছিল এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল। এ যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)। তাঁর সম্পর্কে পারসিভাল স্পিয়ার 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইয়ে লিখেছেন :

"ভিক্টোরিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়ের চিন্তাধারার স্পর্শে উজ্জীবিত রোমান্টিকধর্মী আভিজাত্যমণ্ডিত হয়ে তিনি একজন জুনিয়র সরকারি কর্মচারি থেকে উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চল্লিশ বছর বয়সে এই দায়িত্ব লাভ করেন। .... তিনি ভবিষ্যতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ভারতে তাঁর কার্যক্রমে সাফল্যের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি ও ডালহৌসির মতো ভারত তাঁকেও প্রতারিত করল এবং এখানেই তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পরিসমাপ্তি হতে চলেছিল।"

লর্ড কার্জন দুই দফায় মোট পাঁচ বছরকাল ভাইসরয় ছিলেন। প্রথমে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। কার্জন ভারতীয় ইতিহাসের সবচে' বিতর্কিত ভাইসরয় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়াল হল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি), প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ স্বার্থে আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য 'ডুরান্ড লাইন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অব্যবস্থা তদন্তের লক্ষ্যে কার্জনের নির্দেশে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে কলকাতার বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল বিক্ষুব্ধ হয়। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই প্রশাসনিক কাজের সুবিধা ও অনুন্নত এলাকার সমৃদ্ধি সাধনের যুক্তিতে বিশাল আয়তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে পূর্ববঙ্গ ভাগ করে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ চিন্তার উদ্‌গাতা ছিলেন না। 'টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক ল্যোভট ফ্রেসার 'ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফটার' গ্রন্থে তথ্য প্রকাশ করেছেন, ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার হিসেবে স্যার এন্ড্রু ফ্রেসার সম্বলপুর জেলার আদালতের ভাষা উড়িয়ার পরিবর্তে হিন্দী করার অনুমতি চেয়ে গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সাথে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারত সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব ব্যামফিল্ড ফুলার ও স্বরাষ্ট্র সচিব জে পি হেওয়েট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করার সরাসরি বিরোধিতা করেন। ইতোমধ্যে বেরার অঞ্চল ইংরেজ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে ইংরেজ শাসিত সব প্রদেশের সীমানা নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এন্ড্রু ফ্রেসার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখান।

১৯০৫ সালে ইংরেজ শাসিত মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল ৬১টি পৌরসভা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে পৌরসভা ছিল ১৫৮টি। এ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কলকাতার লোকসংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতাসহ ১৫৮টি পৌরসভার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি লে. গভর্নরের একক হাতে। ১৯০৩ সালে ইংরেজ শাসিত তিনটি বড় প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ছিল সবচে' বেশি। মাদ্রাজে সাড়ে ৪২ মিলিয়ন, ইউ পিতে সাড়ে ৪৮ মিলিয়ন এবং বেঙ্গলে ৭৮ মিলিয়ন। এই অবস্থায় ১৯০২ সালের ২৪ মে লর্ড কার্জন লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড হ্যামিল্টনের কাছে প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভাগ করার যুক্তি দেখিয়ে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন, এক ব্যক্তির প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য এটি অসম্ভবরূপে একটি বৃহৎ প্রদেশ। এই চিঠির জের ধরে ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব হার্বার্ট রিসলে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বের প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে চিঠি পাঠান। তাতে তিনি ইংরেজ শাসিত প্রদেশগুলোর সীমানা পুনঃনির্ধারনের প্রসঙ্গ ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। এই চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের রূপরেখাও উপস্থাপন করা হয়। তিনি লিখেছেন :

> "অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রায় সারা বছর সফর করলেও নিজের এলাকার একাংশের বেশি পরিদর্শনে সক্ষম হবেন না। পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেও তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, রাঁচি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান একবারের বেশি সফর করা অসম্ভব।"

চিঠিতে বলা হয় : (ক) মাদ্রাজের উড়িয়াভাষী এলাকা বাংলার সাথে যুক্ত করা হবে, (খ) ছোট নাগপুরের বিরাট অংশ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং (গ) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন থেকে ৬০ মিলিয়নে হ্রাস পাবে এবং বেঙ্গলের ২৪,৮৮৪ বর্গমাইল এলাকা আসাম প্রদেশের আওতাভুক্ত হবে। উপরন্তু প্রায় ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যা সম্বলিত সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশ চট্টগ্রামের মতো একটি বন্দরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে। আসামের প্রশাসনের জন্য একটা পৃথক সিভিল চালু করাও সম্ভব হবে।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন। তিনি ১৯০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা এবং ২০ ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহী সফর করেন। উন্নততর প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সফরের আগে তিনি তার স্ত্রীকে এক চিঠিতে বলেন : 'পূর্ব বঙ্গ আলাদা করার বিরুদ্ধে পুরোদমে হৈচৈ চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন যুক্তি দেখানো হয়নি।'

লর্ড কার্জনকে ঢাকায় বিপুলভাবে সংর্ধনা দেওয়া হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ্ তাঁর সম্মানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে রাজপথ সজ্জিত করেন। নওয়াব বাড়িতেই কার্জনের মেহমানদারী করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে সংবর্ধনা দানকালে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি, ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি, প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির পক্ষ থেকে একটি এবং জমিদারদের পক্ষ থেকে একটি– মোট চারটি মানপত্র দেওয়া হয়। প্রতিটি মানপত্রেই বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ লর্ড কার্জনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর প্রকাশ্যে বঙ্গ বিভাগের প্রতি সমর্থন জানান। চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী ও ঢাকা সফর করে কার্জন আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন যে, পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা বিলাতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯০৫ সালের জুন মাসে ভারত সচিব সেটি অনুমোদন করেন। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব প্রচার করা হয় ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই। ১ সেপ্টেম্বর নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। লর্ড কার্জন নতুন প্রদেশের নাম দিয়েছিলেন 'উত্তর-পূর্ব প্রদেশ'। সেভাবেই তা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১ অক্টোবর ভারত সচিব নতুন প্রদেশের নাম 'পূর্ববাংলা ও আসাম' রাখার পরামর্শ দিয়ে তারবার্তা পাঠান। অবশেষে প্রবল উত্তাপ আর উত্তেজনার মধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' জন্ম লাভ করে। নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর হলেন আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফিল্ড ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫)।

প্রায় পৌনে দু'শ বছরের ব্যবধানে ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল। চট্টগ্রাম হলো প্রধান বন্দর-নগরী। নতুন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা ও রাজস্ব-বোর্ড থাকবে। কিন্তু হাইকোর্টের এলাকা থাকল অপরিবর্তিত। অবিভক্ত বাংলার ১৮টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলো হলো : ১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালি, ৩. বাকেরগঞ্জ, ৪. ফরিদপুর, ৫. ত্রিপুরা, ৬. ঢাকা, ৭. মোমেনশাহী, ৮. পাবনা, ৯. বগুড়া, ১০. রাজশাহী, ১১. মালদহ, ১২. দিনাজপুর, ১৩. রংপুর, ১৪. জলপাইগুড়ি, ১৫. কুচবিহার ও ১৬. পার্বত্য ত্রিপুরা।

মালদহ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে কোন হিন্দীভাষী এলাকা নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। চা ও পাট ছাড়াও বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই নতুন প্রদেশের আয়তন হলো ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমান এক কোটি ৮০ লাখ, আর হিন্দু এক কোটি ২০ লাখ। বাকিরা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে থাকল তার পুব দিকের বিভাগসমূহ, ছোট নাগপুরের পাঁচটি হিন্দী রাজ্য ছাড়া বাকি অংশ এবং সম্বলপুর ও ৫টি উড়িয়া রাজ্য। বঙ্গ বিভাগের পরও বেঙ্গল

প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল। আর লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। তার মধ্যে ৪ কোটি বিশ লাখ হিন্দু, ৬০ লাখ মুসলমান।

ঢাকা ও কলকাতা : বিপরীত স্রোতের যাত্রী

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালীন অধ্যায়রূপে বঙ্গভঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের অভিঘাত। বঙ্গভঙ্গ ইংরেজ আমলের সবচে' চাঞ্চল্যকর ও সর্বাধিক বিতর্কিত ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার বর্ণহিন্দুরা দেড়শ' বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাদের ভাগ্য-বিধাতাদের 'বয়কট' করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা সবখানে সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক ভবিষ্যত। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে নিদারুণ মর্ম-যাতনা নিয়ে অপরিণত বয়সে ইনতেকাল করেন ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম লীগ নামে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের সংগ্রামে পরিচালিত করে। বঙ্গভঙ্গের তিক্ত ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে কলকাতার বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য খর্ব করার জন্য ১৫৪ বছর পর কলকাতা থেকে ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। কলকাতা তার পুরনো মর্যাদা আর কখনো ফিরে পায়নি।

ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিশাল 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি' ভাগ করেছিল। এটিকে তারা দেখেছিল একটি বলিষ্ঠ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তরূপে। পূর্ববাংলার ভাগ্য-বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে দেখেছিল তাদের 'ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত'-রূপে। অন্যদিকে ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছে তাদের দেড়শ' বছরে গড়ে তোলা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর একটি কঠিন আঘাতরূপে। তাদের ভাষায় এ ঘটনা ছিল 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়'। বঙ্গবঙ্গের ঘটনায় ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যশ্রেণী ছিল আনন্দিত এবং এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত। আর কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল, 'গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি আর কখনো এত বড় দুর্দিনের শিকার হয়নি।"

বঙ্গভঙ্গকে বর্ণহিন্দুরা চিহ্নিত করেছে 'বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ' রূপে। তারা বলেছে, একটি প্রাচীন প্রদেশ যেসব আচার-ব্যবহারও রীতি-নীতির পুরনো বন্ধনে যুক্ত ছিল, বঙ্গ প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত করে সেগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছে। এটাই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। অথচ দূর অতীতে কিংবা নিকট অতীতে পরিবর্তনশীল সীমানার অধীনে বাংলা নামে

কোন দেশ ছিল না। দূর অতীতে এই অঞ্চল অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, রাঢ়, সূহ্ম প্রভৃতি নামে বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বাংলার মুসলিম সুলতানী আমলেই প্রথমবার শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে 'বাংগালাহ' নামে একটি বিস্তীর্ণ এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তার অধীনে সংস্থাপিত করা হয়েছিল। সেই সীমানা বঙ্গভঙ্গকালীন বাংলার অনুরূপ ছিল না। এরপরেও বারবার রাজ্যের বহিঃসীমানা এবং অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক বিভাগসমূহে নিরন্তর পরিবর্তন এসেছে। সুলতানী আমলের তিনটি ইকলিম বা প্রদেশ ছিল সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতি। শেরশাহ তাঁর প্রশাসনিক বিবেচনায় এই তিন প্রদেশকে ১৯টি 'সরকার' ও ৬৮২টি পরগণায় ভাগ করেন। এরপর মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে শেরশাহের আমলের বিভাগসমূহ পরিবর্তন করে তাঁর শাসনাধীন এলাকাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় পুনর্বিন্যাস করেন। সুবাহদারী আমলে প্রায়শ বাংলা ও বিহারের জন্য সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথক সুবাহদার নিযুক্ত হতেন। বাংলা প্রদেশ একাধিক নায়েব-নাযিমের অধীনে ন্যস্ত ছিল। তাদের ওপর ছিলেন সুবাহদার। নবাবী আমলে শতবর্ষব্যাপী ঢাকা ছিল সুবাহ বাংলার রাজধানী। সুবাহদারগণ প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো শাসন পরিচালনা করেছেন। তাঁদের আমলে একটি স্বাধীন রাজধানীর মেজাজ নিয়েই ঢাকা নগরী বেড়ে উঠেছিল। এরপর মুর্শিদ কুলী খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সে সময় এবং তার দীর্ঘদিন পরও কলকাতা ছিল ধানক্ষেত, কলাবাগান আর জঙ্গল অধ্যুষিত 'গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটি' গ্রাম-সমষ্টি মাত্র। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার যে আকার বা গঠন বিন্যাস, তা ছিল একেবারে সাম্প্রতিক বিষয়। বৃটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে কায়েম হওয়ার অনেক পরে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল। অর্থাৎ যে বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণায় কলকাতার বর্ণহিন্দুরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে ছটফট করছিলেন, সেই বাংলার বয়স তখন ছিল একশ' বছরেরও কম।

কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার ছয় কারণ

'বঙ্গ মাতা'র অখন্ডতার প্রশ্ন তুলে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা গরিষ্ঠ হিন্দু জনতাকে ধর্মীয়ভাবে উন্মাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আসল কারণ ছিল ভিন্নরূপ। সরকারি নথিপত্র, পত্র-পত্রিকার সমসাময়িক বিবরণ এবং বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের আলোকে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতার ছয়টি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায় :

এক.

ইংরেজদের নতুন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বর্ণহিন্দু ভূমি-বিচ্ছিন্ন, অনুপস্থিত নব্য জমিদারগোষ্ঠী প্রজা-শোষণের নানারূপ কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থে কলকাতায় যে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছিলেন, বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তারা নানাবিধ স্বার্থহানির বিপদ দেখতে পেলেন। নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য ঢাকায় এখন আলাদা অফিস বসাতে হবে।

ফলে খরচ বাড়বে। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-প্রজারা মুসলমান আর জমিদাররা হিন্দু হওয়ায় নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে সেই মুসলিম প্রজারা জমিদারদের জুলুমের প্রতিবাদ ও খাজনা কমানোর আন্দোলন শুরু করতে পারে। তৃতীয়ত, আসামের ভূমি-ব্যবস্থা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে আলাদা এবং প্রতি ত্রিশ বছর পর রাজস্বের হার নতুনভাবে নির্ধারণ করা হতো। এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার জমিদারদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না।

দুই.

পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা হবে বলে অনেক ব্যবসা চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীরা এটিকে তাদের ব্যবসায়িক কায়েমী স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচনা করে।

তিন. কলকাতার বর্ণহিন্দু আইনজীবীদের ভয় ছিল, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে এবং তাদের বহু মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চার.

কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, নতুন প্রদেশ স্থাপিত হওয়ার কারণে বিকাশমান ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তদের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হবে। ফলে মুসলিম জন অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় কলকাতার পত্র-পত্রিকার বিরাট বাজার নষ্ট হবে। এবং বড় কথা, প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনাকে বিকশিত ও শাণিত করবে সংবাদ মাধ্যম।

পাঁচ.

কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রাজনীতিকরা শংকিত ছিলেন যে, নতুন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশের ভাগ্য স্থানান্তরিত হলে বর্ণহিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

ছয়.

হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক তৎকালীন রাজনীবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। সে কারণে তারা মনে করেছিল যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে দেড়শ' বছরের বঞ্চনার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে এটা ছিল একেবারেই অসহ্য। 'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতার শীর্ষস্থানীয় বর্ণ-হিন্দু নেতা, কংগ্রেসপন্থি রাজনীতিবিদ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিষয়টি রাখ-ঢাক ছাড়াই প্রকাশ করেছেন।

তাঁর ভাষায় :

> "For it was openly and officially given-out that Eastern Bengal & Assam was to be a Mohamedan Province; and that credal distinctions were to be recognised as the basis of the new policy to be adopted in the Province." (A Nation in Making, London. P. 187-88)

কলকাতার প্রতিক্রিয়া : 'দেড়শ বছরের বৃহত্তম জাতীয় বিপর্যয়'

কলকাতা নগরীকে ঘিরে ইংরেজ প্রসাদ-পুষ্ট বর্ণহিন্দুদের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থতাড়িত যে মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাদের বঙ্গভঙ্গবিরোধী মারমুখি মনোভঙ্গি ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। রেভারেন্ড জেমস লঙ তাঁর 'পিপস ইনটু সোশ্যাল লাইফ অব ক্যালকাটা' বইয়ে লিখেছেন :

> "কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাথে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে জড়িত; জলাভূমি, জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কিভাবে কলকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনী লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত প্রায় এক লক্ষ সরকারি নথিপত্রের মধ্যে সবিস্তারে লেখা রয়েছে।"

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের প্রতিক্রিয়াকে তাদের বিশেষ মানসিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করতে হবে। আর এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য কলকাতা নগরীর ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি নযর ফেরাতে হবে। ১৭৭৪ সাল থেকে দেড়শ বছর ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর উতরিয়ে উঠে গেছে একেবারে শীর্ষ-চূড়ায়। তাদের সেই উত্থান-আরোহণের কার্যকারণরূপে পূর্ববাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক-প্রজাসাধারণ পতনের একটির পর একটি ধাপ বেয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল অন্ধকারে। একদিকে বর্ণহিন্দুদের উত্থান, অন্যদিকে মুসলমানদের পতন– এসব কিছুরই মধ্যবিন্দুতে কলকাতা। বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের দ্রুত বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিতেই তাই তালাশ করতে হবে।

ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর করার আগেই কলকাতার জমিদার, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' (১৯০৩-১৯০৮)-এ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন।

তাতে বলা হয় :

"বিক্রমপুরের 'বাবুগণ' এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, অধস্তন সরকারি চাকুরিতে তাদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু'পাড়েই যেসব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে তাদের দুই সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে; ভাগ্যকুলের রায়েরা– কলিকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা– ভীত হয়েছে এই জন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্যপথ খোলা হবে; কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয়, শেষ পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার অনেকটা হ্রাস পাবে; চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশে (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস– রাজনীতিতে কলিকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।"

১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচে' বেশি আতংকগ্রস্ত হয়েছিল কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদারগোষ্ঠী। এরা অন্য সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনুগত ছিল। কিন্তু নিজেদের বড় রকমের স্বার্থহানির আশঙ্কায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নিয়েছে। ড. অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন :

"বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে।...... জমিদারশ্রেণী – যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারী ছিল– এই ভাবনায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাঙলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা! কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ববাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ববাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকুরির সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশঙ্কায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারি চাকুরি, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদি ইতোমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। ..... সুতরাং বেকারীর ভয় বাস্তব।" (রবীন্দ্রনাথ– রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা ১২১-১২৩, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২)

বঙ্গভঙ্গের ফলে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি. বি. মিশ্র তাঁর গ্রন্থ 'দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস'-এ লিখেছেন :

... এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল, বিশেষত তখন বিধান সভাগুলির সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীত চক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধান সভায় তারা একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে– পূর্ববাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিমবাংলায় বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা – এজন্য তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠল।"

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য শিক্ষিত শ্রেণী ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাদের কার্যক্রমে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বললেন, "গোপনে এই বঙ্গভঙ্গ চিন্তার সূত্রপাত, গোপনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে আর গোপনেই এর চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।" কংগ্রেসের এককালের সভাপতি মোমেনশাহীর আনন্দমোহন বসু বঙ্গভঙ্গ বানচালের প্রকাশ্য শপথ ঘোষণা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ৬ জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভুপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'বেংগলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'একটি গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' রূপে চিহ্নিত করা হয়। হিতবাদী পত্রিকা লিখল :

"গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি এই রকম দুর্দিনের সম্মুখিন হয়নি।"

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এসব সভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আধুনিক ভারত, প্রথম খণ্ড)

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'স্বদেশী' নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। সে আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে বিলাতী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই বাগেরহাটে এক জনসভায় বিলাতি পণ্য বর্জন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হোক। পরবর্তী ছয় মাস সব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। কলকাতার রিপন কলেজে দু'দিনব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতি পণ্য পোড়ানোর আহ্বান জানানো হয় এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' ১৫৯টি

শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে (প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক ভারত)।

মহারাজা গিরিজা নাথের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে এক সভায় বছরব্যাপী জাতীয় শোক পালন এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সকল সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাতে যুদ্ধ-মন্ত্রের মতো 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয় এবং বিভক্ত 'বাংলা-মা'-এর পুনঃসংযোজন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে মনীন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে বাংলার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, "বঙ্গ বিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার হবে না।' বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অন্নদা চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বড়লাটের কাছে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), তাঁর সহযোগী ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫), মোমেনশাহীর অনাথবন্দু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল, কলকাতার অরবিন্দু বোস (১৮৭২-১৯৫৯), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনে ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নর্থব্রুক হলের সভাস্থলে মিলিত হয়ে যখন নতুন প্রদেশের উন্নয়নে তাঁদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কলকাতার চেহারা সেদিন সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন :

> "১৬ অক্টোবর এদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখী বন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কোলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগ-জর্জর আনন্দমোহন বসু 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে

এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।" (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, পৃষ্ঠা ২১৩)

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত বর্ণহিন্দু চরমপন্থি নেতৃবৃন্দের কব্জায় চলে যায়। ১৯০৬ সালে এসে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শুভেচ্ছাপুষ্ট অনুশীলন সমিতি এ সময় পুরাপুরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকানন্দের 'নব্য হিন্দুবাদের' দীক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণহিন্দুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন এবং কালী মন্দিরকে ঘিরে শক্তি সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উগ্রমূর্তি নিয়ে হামলা চালাতে থাকে। চরমপন্থিরা ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে নরমপন্থিদের সাথে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্ম-রাজ্যে বিশ্বাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে মারামারি হয়।

১৯০৭ সাল ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চরম পর্যায়। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯১০ সালে এসে এই আন্দোলনের উন্মত্ততা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বর্ণহিন্দু লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সরকার বিরোধিতার সাথে সাথে মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রাখী বন্ধন, কালী মন্দিরে শপথগ্রহণ, বন্দে মাতরম স্লোগান, এমনি অসংখ্য হিন্দু আচার এই আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। রাস্তাঘাটে সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠি মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে 'পিঁয়াজের গন্ধ আসে' বলে অভিযোগ তুলে তাদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। ক্লাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়। (নিরোদচন্দ্র চৌধুরী : অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃষ্ঠা ২৩৭)

কংগ্রেসপন্থি ভারতীয় গবেষক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস অশ্বিনী কুমারের সাথে সাথে থাকতেন এবং 'স্বদেশী যাত্রার' প্রবর্তক হিসেবে এ সময় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

সম্প্রতি কলকাতার বসুমতি সাহিত্য মন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী'তে উল্লেখ করা হয়েছে :

> "বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 'আনন্দময়ী আশ্রম'। .... 'মাতৃপূজা' তাহার প্রথম যাত্রাভিনয়।"

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক অন্যান্য যাত্রাগানেও সকলেই 'বন্দে মাতরম' এর জয়গান গেয়েছেন এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রশস্তির লক্ষ্যে বীর পূজা চালু করেছেন।– এর মধ্যে মথুর সাহার 'পদ্মিণী' ও 'ভরতপুরের দুর্গজয়', ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা', শশী অধিকারীর 'প্রতাপাদিত্য', ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'রামলীলাবসান', 'মনিপুরের গৌরব,' 'মনোজয়ের মহামুক্তি' হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রণজিত রাজার জীবযজ্ঞ' উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে আগাগোড়াই লক্ষণীয় বিষয় হলো বর্ণহিন্দু নেতাদের সাংস্কৃতিক প্রেরণা। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক বক্তব্যের চাইতেও সাংস্কৃতিক বিবেচনা বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। এ আন্দোলনের যা কিছু অর্জন, তা এসেছে এ পথেই। আর তাদের এই সংস্কৃতির বাতাবরণ ও অন্তরাত্মা পুরোপুরি হিন্দু। এ সম্পর্কে ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের অমৃতসর অধিবেশনে সৈয়দ আলী ইমাম সভাপতির ভাষণে বলেন :

> "I can not say what you think, but when I find the most advanced province of India put forward the sectarian cry of 'Bande Mataram' as the national cry, and the sectarian Rakhi Bandhan as a national observance, my heart is filled with despair and disappointment : and the suspicion that under the cloak of nationalism "Hindu nationalism" is being preached in India becomes a conviction." (Sharifuddin Pirzada : Foundation of Pakistan. vol.-1, p- 151)

ঢাকার প্রতিক্রিয়া : ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত

বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ায় বিশেষভাবে পূর্ববাংলার মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এর মধ্যে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন তাদের বঞ্চনার অবসানের সূচনা–ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত–কৈশোর উত্তীর্ণ বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশধারা ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা আর সংখ্যাগরিষ্ঠ 'কর্দমে প্রোথিত' কৃষক-প্রজাদের দীর্ঘকালীন জুলুম-শোষণের অবসান। বঙ্গ বিভাগের আগে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমা 'টাওয়ার বঙ্গের' লুণ্ঠনক্ষেত্র– 'খামার-বাড়ি'। পূর্ববাংলার

কৃষকদের উৎপাদিত কাঁচামালের সিংহভাগ কলকাতা ও তার আশপাশের জেলাগুলোর উন্নতির কাজে ব্যবহার হতো। পুবের কাঁচামালে পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল শিল্প-কারখানা। পুবের কৃষকদের রক্ত পানি করা শ্রমের ফসলে পশ্চিমের উচুঁকোঠার লোকেরা পশ্চিমে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়, গড়ে তুলেছেন কলকাতার বাবু কালচার। পুবের শ্রম আর ঘামের ফসল আত্মসাৎ করে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাবুশ্রেণীর জীবনে এসেছে রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দু ধনিকশ্রেণী এখান থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত মূলধন ব্যয় করত কলকাতায়, সেখানেই তারা গড়ে তুলেছে স্কুল কলেজ-হাসপাতাল। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলাকে লুণ্ঠন করেই 'গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটির' জঙ্গল, ধানক্ষেত আর কলাবাগান-এর ভেতর থেকে মাথা তুলেছে মহানগরী কলকাতা। ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় কলকাতার অবাধ লুণ্ঠনক্ষেত্র– রিক্ত নিঃস্ব পূর্ববাংলা আবার নতুন করে মাথা জাগানোর সুযোগ পেল। বঙ্গভঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতিক্রিয়া এই পটভূমিতেই বিচার্য। এই পটভূমিতেই ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের নতুন ভোরে ঢাকার নর্থব্রুক হলের এক সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে নতুন প্রদেশ গড়ে তোলার প্রেরণায় জন্ম লাভ করে 'প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। নতুন প্রদেশের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পূর্ববাংলার মুসলমান ছাড়াও এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার মুসলমানরা এই নতুন প্রদেশ গঠনের প্রতি সমর্থন জানান। বর্ণহিন্দুরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরা ছিলেন নতুন পরিবর্তনের পক্ষে। কারণ বর্ণহিন্দুদের আর্থিক ও সামাজিক নিপীড়নের কারণে মুসলমানদের মতো তারাও ছিলেন ক্ষুব্ধ। এ প্রসঙ্গে তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর বি. আর আম্বেদকর বলেন :

> "সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এমনকি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার বর্ণহিন্দুদের চারণভূমি। প্রদেশের সবগুলো সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বঙ্গ বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমির সীমানা সংকোচন। বঙ্গ বিভাগের প্রতি হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া।" (বি. আর আম্বেদকর : পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১১)।

পূর্ববাংলার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যারা বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করেছেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি বলেন :

> "আমি বঙ্গ বিভাগ নীতির বিপক্ষে নই; বরং স্বপক্ষে। আমার বিশ্বাস এর ফলে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানাভাবে অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হবে। ঢাকার রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর

বিশেষ বাণিজ্য স্থান হতে চলল; পূর্ববঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হলো; এদেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হবে; দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে; আসাম প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করবে এটা ভেবে আমার আহলাদ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছেড়ে দেই। বাঙালিদের উন্নতির দর্শন অনেকের চক্ষুশূল হতে পারে। কলকাতা অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা যে কোন অফিসে তাদের (কলকাতাবাসীদের) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। এখানকার (কলকাতার) কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হয়ে রয়েছে।" (আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১১৯-২০)।

মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাগুলো শুরু থেকেই বঙ্গ বিভাগের সমর্থনে ভূমিকা পালন করে। নবগঠিত প্রদেশের প্রতি কলকাতার মুসলমানদের সমর্থন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ছিল পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতি তাদের আন্তরিক দরদ ও স্বজাত্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। বিহার ও উড়িষ্যার মুসলিম নেতৃবৃন্দও বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানান। কারণ এতে তাঁরাও কলকাতার বর্ণহিন্দু বাবুশ্রেণীর আধিপত্য থেকে নিস্তার লাভের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন।

বঙ্গ বিভাগের বিষয়টি আঞ্চলিক হলেও তা উপমহাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। নতুন প্রদেশের প্রতি উপমহাদেশীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনকে ত্বরান্বিত করে। মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় আটশ 'মুসলিম প্রতিনিধির এক বিশেষ সভায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানানো হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৮ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর অমৃতসরে মুসলিম লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও বঙ্গ বিভাগের সমর্থনে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সলীমুল্লাহর সহকর্মী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত প্রস্তাব উথাপন করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন :

"What was the state of affairs in the eastern part of the province, specially in the tracts of watered by the Brahmaputra, the Padma and the Meghna? They were so detached and segregated from the centre of administrative influence that it was impossible under the

old system to have hoped for any improvement, social, political, educational or commercial, before many long years to come". (Qouted by Sharifuddin Pirzada : Foundation of Pakistan. vol-1, P-85)

১৯১০ সালের জানুয়ারিতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের তৃতীয় অধিবেশনেও হিন্দুদের সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহীত হয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের আন্দোলন তীব্র হওয়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃদ্ধি পেয়েছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ব্যাপকভাবে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"…. স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনেও এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর', 'হাফিজ'-এ মুসলমান লেখকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন তা উগ্রভাবে ইসলামবিরোধী। …… কিন্তু সাধারণ মুসলমান কৃষিজীবী সম্প্রদায় কেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ হলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ও ভূস্বামীগণ ছিলেন হিন্দু এবং তারাই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান প্রজা অধ্যুষিত তাদের ভূসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দু জমিদারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। …. অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়।" (আধুনিক ভারত, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩)

কংগ্রেসী বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগের প্রথম বর্ষপূর্তি জাঁকালোভাবে উদযাপন করা হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকা, মোমেনশাহী, ফরিদপুর ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করেন। এসব জনসভা নস্যাত করার জন্য বর্ণহিন্দুরা নানাভাবে চেষ্টা করে, প্রতিবাদ জানায়, এমনকি হামলা চালায়। কুমিল্লায় এ উপলক্ষে একটি জনসভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর ওপর হামলা পরিচালনা করা হয়। সলীমুল্লাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বর্ণহিন্দুদের নানামুখী উস্কানী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেন।

হিন্দু জমিদাররা বঙ্গ বিভাগ রদ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলিম প্রজাদের সমর্থন আদায়ের জন্য নানাভাবে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ঋণের টাকা আদায়ের জন্য

মহাজনরা বল প্রয়োগ করে। এসব সত্ত্বেও মুসলমান ও তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী জমিদার মহাজনদের মুসলিম নির্যাতনের অনেক কাহিনী তখনকার মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা দখল করে।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতাকারীদের মধ্যে এ সময়কার কয়েকজন মুসলমানেরও নাম পাওয়া যায়। ড. এম কে ইউ মোল্লা প্রদত্ত এই তালিকায় নবাব সলীমুল্লাহর সৎভাই খাজা আতিকুল্লাহ, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কুমিল্লার ব্যারিস্টার আবদুর রসূল এবং নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন অন্যতম। এছাড়া আরো যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন সাংবাদিক মুজিবর রহমান, দেলদুয়ারের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী, আবুল হোসেন, বর্ধমানের আবুল কাসেম, দীন মোহাম্মদ, দিদার বখশ ও আবদুল গফুর। ড. মফিজুল্লাহ কবির-এর বরাত দিয়ে ড. মোল্লা জানাচ্ছেন, সলীমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ নওয়াবের সাথে বৈষয়িক বিবাদের জের হিসেবে বঙ্গবিভাগের বিরোধী ভূমিকা নিলেও বিবাদ মিটে যাওয়ার পরপরই বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কাজ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরীর প্রতিবাদ লিপি পাঠানোর ব্যাপারটি একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার লিপিটি কলকাতায় প্রণীত হয় এবং স্বাক্ষরকারী প্রথম চারজন মুসলমানের মধ্যে দু'জন ছিল হিন্দু আইনজীবীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ফরিদপুরের লোন অফিস পাড়ায় ঋণভারে জর্জরিত। তৃতীয় দস্তখতকারী একজন অমিতচারী মুসলিম যুবক, বর্তমান পরিভাষায় ভাড়াটে 'মাস্তান'। লোয়াখালির লিয়াকত হোসেন সম্পর্কিত তথ্য আরো চাঞ্চল্যকর। ১৯০৭ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চীফ সেক্রেটারি পি, সি, লিওন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যে নোট পাঠান, তার বরাত দিয়ে ড. মোল্লা জানাচ্ছেন, বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোর জন্য বর্ণহিন্দুরা লিয়াকত হোসেনকে মাসে চল্লিশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করত। ব্যারিস্টার আবদুর রসূল শুরুতে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করলেও পরে সলীমুল্লাহর সাথে কাজ করেন। কংগ্রেসপন্থি মুসলিম জমিদার দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবীর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আসল কারণ ছিল জমিদারী স্বার্থ। আবুল কাসেমও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ড ভারতের নীতির পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। আর দীন মোহাম্মদ ও আবদুল গফুর-এর বিরোধিতা ছিল লিয়াকত হোসেনের মতোই আর্থিক স্বার্থতাড়িত।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের হাতে গণা ঐসব মুসলিম সমর্থক সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর লেন্সলট হেয়ার মন্তব্য করেছেন :

"The Mohamedans who took part in the agitation are in many cases the paid agents of the Hindu leaders. While others are under the thumbs of the same men, owing to financial embarrassments and to the fact that they are under Hindu landlords. There are practically none, who carry any real weight or who can be called representative." (Quoted in M K U Molla : The New. Province of Eastern Bengal & Assam)

পূর্ববাংলায় উন্নয়নের সুবাতাস

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নতুন প্রদেশ গঠনের সাথে সাথে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ অবহেলিত এই এলাকায় উন্নয়নের একটি নতুন যুগ শুরু হয়। নব গঠিত প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠনের লক্ষ্যে অফিস-আদালত নির্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়। পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই নতুন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। ১৯০৯ সালে অনুমোদিত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদ'। এ সময়ের মধ্যেই নতুন প্রদেশে উন্নয়নের কিছুটা ছাপ পড়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে ১৯১০ সালের ৫ এপ্রিল পরিষদের সভায় রায় সীতারাম রায় রাজধানী ঢাকার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন :

"But so far as the new town on the northern part of Dhaka is concerned, it is in its external aspect altogether a different thing from what it was only five years before. The dense jungles of the Ramna field have been thoroughly cleared and swept away and the vast maidan on the north has been converted, as if by the wand of a magician, into a fairy land, dotted with large and stately buildings, such as the Secretariat buildings, college buildings, Engineering college, and the new Government House and numerous charming bungalows and intersected by a number of very wide roads, and the whole maidan now looks picturesque and compares favourably, if I may say so, with Chowringhee of Calcutta." (The Eastern Bengal & Assan Gazette, Part VI, April 27, 1910, P. 50-58)

ঢাকার ইতিহাসের সমসাময়িক লেখক মুনশী রহমান আলী তায়েশ তাঁর বিখ্যাত 'তাওয়ারিখে ঢাকা' গ্রন্থে ১৯১০ সালের অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন :

"ঢাকা এক সময় ছিল ইসলামী রাজধানী। ব্রিটিশ শাসনামলে অনেককাল পর তা আবার রাজধানীতে পরিণত হলো। এখন নবযুগের সূচনা হয়েছে, ঢাকাবাসীর সুপ্ত ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। এখন উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে। ঢাকাতে একটি সিভিল সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে যেসব স্থানে জাঁকালো সৌধ এবং শাহী প্রাসাদ দণ্ডায়মান ছিল, আল্লাহর শুকুর, সে সব জায়গায় আবার নতুন নির্মাণ কাজ চলছে। এই সব উচ্ছন্ন স্থানে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত এলাকাকে বলা হয় 'নিউ টাউন'।"

বঙ্গভঙ্গের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের যে অসামান্য উন্নতি হয়, তার মধ্যে সবচে' উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে হলো শিক্ষা। মধ্যবিত্ত বিকাশের ধারা এ সময় দ্রুত এগিয়ে চলছিল। নতুন প্রেরণায় মধ্যশ্রেণী এমন কি কৃষক-প্রজাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় মুন্সিগঞ্জে এক জনসভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ বলেন :

"বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।"

বঙ্গভঙ্গ রদ : মুসলিম ভারতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

১৯১০ সাল থেকেই বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার উত্তাপ কমে এসেছিল। অরাজকতা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কারণে ১৯১১ সালের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভার আলোচনার সমাপ্তি টেনে লে. গভর্নর হেয়ার নতুন প্রদেশের বিভিন্নমুখী অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন :

"জনগণের মধ্যে নতুন প্রদেশের নাগরিক হিসেবে গৌরববোধ সৃষ্টি হয়েছে, বিরোধীদের বিরোধিতার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং বঙ্গভঙ্গের কতিপয় অনমনীয় দুষমণও এখন জনহিতকর বিভিন্ন দুরূহ কাজে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছে।" (দি ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯১১, পৃষ্ঠা ৮১-৮৪)

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে উন্নতির গতিধারা যখন সবেমাত্র শুরু হয়ে পুরোদমে এগিয়ে চলছিল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল শান্ত এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। একখণ্ড ঝড় এসে যেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিকাশমান সাজানো সংসারকে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে দিল। পূর্ববঙ্গের নেতাদের সাথে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা না করে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিল্লীর দরবার থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং বঙ্গ বিভাগ রদ ঘোষণা করলেন।

ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা সম্পর্কে 'কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল :

> "বন্ধুকে পদাঘাত করে শত্রুকে খুশি করার এরূপ মেকিয়াভেলী-নীতি এমন নির্লজ্জভাবে অতীতে আর কখনো অনুসৃত হয়নি।"

গোখলের দ্বারা প্রভাবিত ভারত সচিব লর্ড মর্লির অনুপ্রেরণায়, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্লজ্জ এই বড় ঘটনাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়। হিন্দুদের বিরাগের চাইতে মুসলমানদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করা ছিল অনেক সহজ কাজ। দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠান করে খোদ রাজা পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে এই ঘোষণা জারি করার মধ্যেও ছিল আরেকটি কৌশলের খেলা। শাসনতান্ত্রিক বিধানের কারণেই সম্রাটের উক্তির বিরুদ্ধে কারো পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয়। এভাবেই মুসলমানদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করা হয়েছিল।

রাজা পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় পূর্ব ও পশ্চিমবাংলাকে সংযুক্ত করে যুক্তবঙ্গীয় প্রদেশ সৃষ্টি করা হলো। এ প্রদেশ থেকে আসামকে সরিয়ে নেওয়া হলো। বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো বিহার ও উড়িষ্যাকে। এই দুই এলাকা নিয়ে গঠন করা হলো একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। আর ব্রিটিশ-ভারতের দেড়শ' বছরের পুরনো রাজধানী স্থানান্তর করা হলো কলকাতা থেকে দিল্লীতে। কলকাতার বর্ণহিন্দুরা নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলেন এবং 'জনগণ-মন-অধিনায়ক হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা' বলে পুরনো সুরে ব্রিটিশ-প্রভুর জয়গান গাইলেন। ইংরেজ শাসকরাও অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, কলকাতার বাইরে ভারতের আর কোথাও তাদের জন্য 'অভয়াশ্রম' ছিল না। ১৯১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লীতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন উপলক্ষে চকবাজার থেকে মিছিল বেরোলো বড়লাটের নেতৃত্বে। এই মিছিলে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। মুসলিম শাসনের প্রাচীন কেন্দ্র দিল্লী এভাবেই ইংরেজদেরকে পুষ্পরেণুর বদলে বারুদ ছিটিয়ে স্বাগত জানালো।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা ভারতের মুসলমানগণ স্তম্ভিত হলেন। এক কঠিন আঘাত মুসলিম-ভারতকে হত-বিহবল করে ফেলল। দারুণভাবে আহত হলেন নওয়াব সলীমুল্লাহ। বাংলার বাইরের মুসলিম নেতাদের মধ্যে সবচে' ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন নওয়াব ওয়াকার উল মুল্ক (১৮৪১-১৯১৭)। দিল্লীর দরবার থেকে ফিরে এসে বঙ্গ বিভাগ রদের মাত্র এক সপ্তাহ পর ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেটে 'ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা' নামে এক আবেগময় প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি বলেন :

> "বঙ্গ বিভাগ রদ করে সরকার মুসলমানদের প্রতি অন্যায় উদাসীনতা দেখিয়েছেন। ... তাই আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প কর্মপন্থার কথা ভাবতে হবে। মধ্যদিনের আলোকিত সূর্যের মতোই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদেরকে

সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকার পরামর্শ দেওয়া অর্থহীন। কারোর ওপর ভরসা করার সময় এখন উত্তীর্ণ। নিজেদের শক্তির ওপরই আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে। আমাদের গৌরবান্বিত পূর্ব-পুরুষগণ আমাদের জাতির জন্য সে নযীর রেখে গেছেন।”

দিল্লীর দরবারে উপস্থিত উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরমার্শ করে নওয়াব সলীমুল্লাহ ওয়াকার উল মূলক-এর প্রবন্ধ প্রকাশের একই তারিখে অর্থাৎ ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আট দফা দাবি সম্বলিত একটি পত্র পেশ করেন। সেই আট দফা দাবি হলো :

১. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির গভর্নর কলকাতা ও ঢাকা এই উভয় রাজধানীতে সমভাবে অবস্থান করবেন;

২. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যানুপাতিক হারে ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে সুযোগ দিতে হবে;

৩. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে অথবা পূর্ববঙ্গের রাজস্ব এখানকার জেলাসমূহের শাসন-ব্যবস্থা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে হবে;

৪. সরকারি চাকরিতে আরো অধিকহারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে। এবং পালাক্রমে একজন হিন্দুর পর একজন মুসলমান সদস্য বঙ্গ প্রেসিডেন্সির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করতে হবে;

৫. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এমন একজন অফিসার থাকতে হবে, যিনি পূর্ববাংলা ও আসামের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

৬. ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে এমন দু'জন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে, যাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য একজন যুগ্ম পরিচালক বা সহ-পরিচালক নিয়োগ করতে হবে;

৭. মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

৮. মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০.
মুসলিম রাজনীতিতে নবচেতনা

বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলার মুসলমানদের নব অংকুরিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ম্লান করে দেওয়ায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে। তারা ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে 'সক্রিয় কর্মপন্থা' অবলম্বনের পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গের ঘটনা 'আলোকপ্রাপ্ত' মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাজানুগত্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলিম ভারতের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের ওয়াদাভঙ্গের কারণে সৃষ্ট মনোবেদনা নিয়েও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। সদ্য বিকাশমান দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনা করে তাঁরা একদিকে পূর্ণ বিকশিত বর্ণহিন্দু, অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তি– এ দুই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া অসময়োচিত বিবেচনা করেন। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ থেকে আসায় তার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জে যাওয়া শাসনতান্ত্রিক বিধিবদ্ধতার কারণে তাঁরা ঠিক মনে করেননি। তাই অনন্যোপায় কর্মপন্থা হিসেবে ব্রিটিশ আনুগত্য বজায় রেখেই জাতির দাবি-দাওয়া আদায়ের বলিষ্ঠ পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত তরুণ একদল মুসলিম রাজনীতিক এ সময় ব্রিটিশানুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলিম বাংলার জন্য স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল গঠনের মনোভাব ব্যক্ত করতে শুরু করেন।

প্যান-ইসলামবাদী নেতা আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পর্কে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন :

> "If we are silent and less vocal, our silence is silence of anger and sorrow and not that of acquiecense. In proportion to our devotion to the person on Throne of His Majesty is the intensity of our resentment at the cowardly device of putting the announcement in

the mouth of the King Emperor and thus muzzling us effectively."
(Matiur Rahman : From Consultation to Confrontation. P. 219)

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রবীণ ও তরুণ মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে যে দু'টি ধারা সৃষ্টি হয়, নওয়াব সলীমুল্লাহ এই দুই শিবিরের মনোভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। (ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : নওয়াব সলীমুল্লাহ) ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে নওয়াব সলীমুল্লাহর ভাষণ বঙ্গভঙ্গজনিত কারণে সৃষ্ট তাঁর গভীর মর্মবেদনার স্মৃতিচিহ্ন। এরপরই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের নাগপুর অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে বলা হয়েছিল 'আত্মনির্ভরতা' বা Self Reliance-এর কথা। আর এখন বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্যান-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'স্বাধিকার আদায়ে'র বাসনা জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল তার সদ্য প্রণীত গঠনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের (Self Government) দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯১৩ সালের ২২ মার্চ মুসলিম লীগের লাখনৌ অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়। এভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ার পথ ধরেই মুসলিম বঙ্গ ও মুসলিম ভারতের রাজনীতি স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব সলীমুল্লাহর রাজনীতির ধারা অতিক্রম করে সক্রিয় রাজনীতিতে পদার্পণ করে।

রাজনীতি থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহর অবসর গ্রহণের পটভূমিতে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সক্রিয়পন্থিগণ মুসলিম বঙ্গে নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের হাল ধরলেন। এই তরুণ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সলীমুল্লাহর মানস-পুত্র আবুল কাসেম ফজলুল হক। সলীমুল্লাহর জীবদ্দশাতেই আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর যুগপ্রবর্তনের ধারা চিহ্নিত করে ১৯১৩ সালের ৪ এপ্রিল কলকাতার ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট বক্তৃতায় প্রবীণ নেতাদের 'আবেদন-নিবেদনের করজোড়-নীতি' ভঙ্গ করে বলিষ্ঠ ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পূরণে বারবার ব্যর্থ হলে ইংরেজ রাজশক্তিকে এজন্য খেসারত দিতে হবে বলে তিনি সাবধান করে দেন। তাঁর এই উক্তি বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নতুন যুগের এই নেতার হাতেই বাংলার মুসলিম রাজনীতি এক নতুন রূপ লাভ করে। (J. H. Broomfield : Elite conflict. P-64)

মুসলিম লীগের জন্ম : নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক ঘটনা-প্রবাহে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের যে দ্বন্দ্ব, তার পটভূমি যেমন বিস্তীর্ণ, তাৎপর্যও তেমনি গভীর। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দুদের সাথে যে মানসিক বিচ্ছেদ তা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় :

> "যদিও তারা একই দেশের মানুষ ছিল, তবুও এক ভাষা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তারা বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আটশ' বছর ধরে তারা বাস করেছে যেন দু'টি ভিন্ন পৃথিবীতে।" (নিরোদচন্দ্র চৌধুরী : অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃষ্ঠা ৫০৪)

মুসলিম শাসনের শুরু থেকে কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ, অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচরণ পদ্ধতি নিয়ে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করেছে। তাদের পারস্পরিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আপাতদৃষ্টিতে বড় রকমের কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনকে হিন্দুরা নিছক শাসক-বদলের ঘটনারূপে গ্রহণ করে। ইংরেজদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রাতারাতি তাদের একটি শ্রেণী বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা এই শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে 'রানীর বিদ্রোহী প্রজা'রূপে অভিহিত হয়। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা ইংজেরদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোন সহানুভূতি ছিল না।

উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়। মুসলমানদেরকে শত্রুরূপে চিহ্নিত করে তাদের ওপর তারা নানামুখী হামলা পরিচালনা করে। কুড়ি শতকের শুরুতে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মারমুখী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলিম জাতি-স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে আরো প্রকটভাবে উপস্থিত করে।

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ মুসলিম চিন্তা-চেতনায় যে সকল ঘাত-সংঘাত সৃষ্টি করে সে পটভূমিতেই উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম রাজনীতি নিজস্ব স্বতন্ত্রধারা রচনায় অগ্রসর হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য একটি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা অর্জন করা ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি আশু বিবেচ্য বিষয়। সৈয়দ আমীর আলী সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় মুসলমানদেরকে একটি 'স্বতন্ত্র জাতি' (Nationality, Nation) নামে অভিহিত করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। এর আগে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে 'কওম' নামে অভিহিত করলেও আমীর আলীর দাবি ছিল অধিকতর রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

১৮৮৩ সালে আমীর আলী 'মিউনিসিপ্যালিটি বিলে' সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। এ সময় থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন কায়েমের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। ১৯০১ সালের অক্টোবরে নওয়াব ওয়াকার উল্ মুল্‌ক লাখনৌতে মুসলমানদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে সাহারানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই-হুসাইন 'মুসলিম লীগ' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।

এ সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করছেন। এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দাবি নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় বড় লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সিমলা ডেপুটেশনে যোগ দেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁরা নওয়াব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেসী গঠনের খসড়া পরিকল্পনা সাথে নিয়ে যান। একই বছর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের উদাত্ত আহবান জানান।

মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সলীমুল্লাহর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ সিমলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাঁরা ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সম্মেলনে কনফেডারেসী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের এক বিশেষ সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আটশ' প্রতিনিধির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবেই ভারতীয় মুসলমানগণ একটি নতুন রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেন। এ রাজনীতির ভিত্তি হলো জাতিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

মুসলমানদের অবিচল ও অব্যাহত দাবির মুখে ১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্কার পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে তাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথও সুগম হয়।

ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর কংগ্রেসপ্রেমিক মুসলমানদের অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হয়। সৈয়দ আমীর আলীর আহ্বানে এ সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন। জিন্নাহর চেষ্টায় ১৯১৩ সালে 'ওয়াকফ বিল' পাস হয় এবং ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের বিধান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : বিজাতীয় প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববাংলার মুসলিম জন-মানস দারুণভাবে আহত ও ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবাদমুখর মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শান্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি তিন দিনের জন্য ঢাকায় আসেন। ৩১ জানুয়ারি নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের এক মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাটের সাথে দেখা করে একটি মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করা হয়। এটি ছিল নওয়াব সলীমুল্লাহর একটি পুরনো দাবি। বড় লাট ঢাকার মুসলমান নেতৃবৃন্দের এই দাবি মেনে নিয়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন এবং এটিকে পূর্ববাংলার জনগণের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে একটি নতুন অনুদান হিসেবে পেশ করেন। ভারত সরকার ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারির এক ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের প্রস্তাব প্রকাশ করার সাথে সাথে কলকাতা ও ঢাকার হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তারা বলেন :

> "এর ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বেড়ে যাবে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা অধিকাংশই কৃষক, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আদৌ কোন উপকার লাভ করতে পারবে না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায়, ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুরে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহীতে সভা করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে বলেন :

> "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে অভ্যন্তরীণভাবে বঙ্গবিভাগের সমতুল্য; তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না।"

৫ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উকিল লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত দু'টি প্রতিবাদ সভায় সভাপতি ছিলেন বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু। সভা দু'টিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

> "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার অবনতি হবে। তাই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দরকার নেই।"

২৬ মার্চ কলকাতা টাউন হলে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

> "কোন স্কুল-কলেজের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার থাকতে পারবে না এবং পূর্ববঙ্গে কোন বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিও থাকতে পারবে না।"

সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল বলেন :

> "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষকবহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষানীতি ও মেধার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই থাকবে না।"

পূর্ববাংলার মুসলমানদের যে-কোনও ধরনের কল্যাণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে বর্ণহিন্দুদের এরূপ অসহিষ্ণু বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিপত্য ও গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং সেই সাথে এর দ্বারা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত মুসলমানদের কল্যাণ হবে, এটাই ছিল বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের আশঙ্কার কারণ। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নেতৃবৃন্দ এক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ধারক ছিলেন। তাঁরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে হৃদয়ের এতটুকু প্রসারতা দেখাতে পারলেন না। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করেই গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠেছে কলকাতার সব কিছু। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কোন 'অসাম্প্রদায়িক মানবহিতৈষী' ব্যক্তিকেই সেদিন এই হিন্দু মানসিকতার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলতে দেখা যায়নি।

১৯১২ সালে ঘোষণা দেওয়ার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বিষয়টি ইম্পোরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। এরপর ২০ মার্চ তিনি সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল পাস করার প্রস্তাব পেশ করেন। কাউন্সিল জানায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল তৈরি হয়েছে এবং যুদ্ধের পর যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৯১৭ সালে এ ব্যাপারে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ন্যাথনে কমিটির রিপোর্ট উক্ত কমিশনে অনুমোদন লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। ভাইসরয় কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যগণ এই কমিশনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেন। এত কিছুর মধ্য দিয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো তার কোন এফিলিয়েটিং ক্ষমতা বা কর্তৃত্বই থাকলো না। কলকাতার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে এটিকে নিছক একটি 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে'র মর্যাদা দেওয়া হলো।

নওয়াব সলীমুল্লাহর দান করা কয়েকশ' বিঘা জমির ওপর ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জুলাই মাসে এখানে ক্লাস চালু হয়। ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমিরূপে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসহ পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন :

> "I was very closely and actively associated with all the plans and schemes and I know the difficulties which we Muslims had to face and the obstinate opposition we had to overcome at the time in pushing the scheme for the establishment of Dhaka University."

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৈঠকেই আবুল কাসেম ফজলুল হক নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে পূর্ববাংলায় উচ্চশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে পূর্ববাংলায় উচ্চশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে। একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ত্বরান্বিত করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এটিকে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে কটাক্ষ করেন। তাদের সকল পরিহাস উপেক্ষা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশের প্রতিভাবান রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ তৈরির কারখানারূপে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার মুসলমানদের জাতিসত্তার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ, গভীর ও ব্যাপক অবদান রাখে।

১১.
হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি : মিলমিশেলের চেষ্টা

কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজী ও গোখলের স্থলে বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও বিপিন পালের মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটল। ফলে এই দলটি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বেদ-উপনিষদ থেকে উৎসারিত হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল তাদের মতে ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রতীক। গণপতি পূজা তাদের জাতীয় অনুষ্ঠান। বন্দে-মাতরম জাতীয় সংগীত। ফলে মুসলমান নেতাগণ শঙ্কিত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনই কায়েম হবে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান ছাড়া অন্য সব প্রদেশে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যালঘু। এ অবস্থায় চল্লিশ কোটি মানুষের অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নয় কোটি মুসলমানের অধিকার ও স্বার্থের জন্য একটা রক্ষাকবচ অর্জন করা ছিল মুসলমান নেতাদের বিবেচনায় অপরিহার্য। এ জন্যে তাঁরা প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নূন্যতম ক্ষমতা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা দাবি করেন।

লাখনৌ চুক্তি

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) ও এ, কে, ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) সহ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি শাসনতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'লাখনৌ চুক্তি' নামে পরিচিত এই চুক্তিতে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা ও আইনসভাগুলোয় আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিধান স্বীকৃত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এই চুক্তির শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল। তখন বাংলার লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪ জন ছিলেন মুসলমান। সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশের মুসলমানদের অতিরিক্ত আসন দেওয়ার স্বার্থে ফজলুল হকসহ মুসলিম নেতাগণ বাংলাদেশের আইন সভায় বাংলার মুসলমানদের জন্য মাত্র শতকরা ৪০টি আসন নিতে সম্মত হন। বাকি আসনগুলো বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই

প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছেড়ে দেন। পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। পাঞ্জাবের মুসলমান নেতাগণ শতকরা ৫০টি আসন রেখে বাকি পাঁচ ভাগ আসন অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশের মুসলমানদের সুবিধার জন্য ছেড়ে দেন। ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে বাংলার মুসলমানদের ত্যাগ ছিল এক নযীরবিহীন ঘটনা।

অসহযোগ আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র রচিত হয়। রাউলাট বিলের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে কয়েকশ লোককে গুলী করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফজলুল হক, সি আর দাস, মতিলাল নেহেরু ও তাইয়েবজীকে নিয়ে এ উপলক্ষে এক বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সে বছরই মাওলানা আবদুল বারীর নেতৃত্বে লাখনৌয়ে তুরস্কের অখন্ডত্ব ও খলীফার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ১৪ নভেম্বর দিল্লীতে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশনে খিলাফত সংক্রান্ত দাবির ভিত্তিতে মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

১৯২০ সালের জুন মাসে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ৩১ আগস্ট মুসলমানরা খিলাফত দিবস পালন করে। সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ্ কলকাতায় এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু অসহযোগ উপলক্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে স্কুল-কলেজ বয়কটের যে কর্মসূচির গৃহিত হয়, জিন্নাহ, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ তার বিরোধিতা করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানরা এর ফলে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফজলুল হক স্পষ্টতই ঘোষণা করেন যে, অসহযোগের নামে স্কুল-কলেজ বয়কট করলে শিক্ষায় শত বছর ধরে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মুসলমানরা, যারা নতুন করে মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তারা আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর সি আর দাস ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে ছাত্রদেরকে স্কুল কলেজ বর্জনের আহ্বান জানান। পরদিনই ফজলুল হক একই ময়দানে সভা করে ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ বর্জন না করার পরামর্শ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগে অগ্রণী মুসলিম নেতৃবৃন্দও সে সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে মুসলিম জনগণকে দমিয়ে দেওয়ার একটি কারসাজি কাজ করছে।

স্কুল-কলেজ বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে মতান্তরের কারণে ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। উগ্রবাদী হিন্দুদের কারণে অসহযোগ আন্দোলন কার্যত মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সময় হিন্দুদের ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী উত্থান ঘটে। হিন্দুরা 'শুদ্ধি আন্দোলন' শুরু করে। তা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীর হাত থেকে কার্যত সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরায় একটি থানা আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের ফলে ২২ জন পুলিশ মারা যাওয়ার পর গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।

জিন্নাহ ও ফজলুল হক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে শুরু থেকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন এবং তাদের মত ছিল যে, এরূপ কর্মসূচি দেশের মুক্তি ত্বরান্বিত না করে বরং বিলম্বিত করবে। তাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট

কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্যের কারণে সি আর দাস ১৯২২ সালে সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। সি আর দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'স্বরাজ পার্টি' গঠিত হয়। এই দুই নেতা উপলব্ধি করেন যে, ব্যবস্থাপক পরিষদের হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংগ্রাম ছাড়া বাংলার স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য তাঁরা দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের সঙ্গত অধিকারসমূহের প্রতি কিছু সহানুভূতি দেখানো অপরিহার্য বিবেচনা করেন। এ পটভূমিতেই সি আর দাস তৎকালীন বাংলার অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সভায় 'বেঙ্গল প্যাক্ট' আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তির সবচে' গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল :

ক. লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ষাট ভাগ আসন পাবে।

গ. সরকারি দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা চাকরিক্ষেত্রে এই পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে শতকরা আশি জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এরপর মুসলমানরা শতকরা ৫৫টি এবং অমুসলমানরা চাকরির শতকরা ৪৫টি পদ পাবে। মধ্যবর্তীকালে হিন্দুদের জন্য শতকরা ২০টি চাকরি বরাদ্দ থাকবে।

ঘ. কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় বিষয়ে কোন আইন পাস করতে হলে সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

ঙ. মসজিদের সামনে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবেহ করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ

১৯২৮ সালের নেহেরু-কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কংগ্রেস লাখনৌ চুক্তিতে স্বীকৃত মুসলমানদের সকল দাবি অস্বীকার করে। কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ভিত্তি ধসে পড়ে। জিন্নাহ এরপর ১৯২৯ সালে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সব দাবি অগ্রাহ্য করেন। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে লন্ডনে তিন দফা গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়নি। এরপরও 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাথে তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি গান্ধীর সাথে পত্র বিনিময় করেন। গান্ধী মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিতেই অস্বীকার করেন। জিন্নাহর সাথে পত্রালাপে জওহরলাল নেহেরু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনায় মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে পত্র বিনিময় করেও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন।

এভাবেই হিন্দু-মুসলিম মিলনের একের পর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১২.
লাহোর প্রস্তাব : জাতীয় ইতিহাসের নতুন মাইলফলক

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার মুসলিম নেতৃত্বকে বিচলিত করে তোলে। এসব প্রদেশের কংগ্রেস সরকার ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির শিক্ষাব্যবস্থা, বন্দে মাতরম সংগীত, শ্রীপদ্ম প্রতীক এবং হিন্দুয়ানী পাঠ্যপুস্তক চালু করেন। ফলে হিন্দুপ্রভাবিত রাজ্যে নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলমানগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অখণ্ড ভারতের আদর্শ সম্পর্কে মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। এ পটভূমিতেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহীত হয়। 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপনকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন :

> "১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। এখন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকেই মুসলমানদের জন্য আমি আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি।"

ল্যাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর পাক-ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁরা অখণ্ড ভারতের চিন্তা থেকে দ্রুত সরে আসেন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ এবং ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে এ দাবি আদায়ে প্রবল বাধার মোকাবিলা করতে হয়।

মুসলিম লীগের শক্তির উৎস বাংলাদেশ

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবি যাচাইয়ের জন্য ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন সভা এবং ১৯৪৬ সালের মার্চে প্রাদেশিক আইন সভার

নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেদের দাবি প্রমাণ করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নেয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, শক্তি ও সংহতি এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক আবাসভূমির দাবির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন এই নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সর্বভারতীয় মানচিত্রে সর্বাধিক মুসলিম জন-অধ্যুষিত বাংলাদেশের মুসলমানগণ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, এ প্রদেশই 'মুসলিম লীগের শক্তির প্রধান উৎস' এবং 'ভারতীয় মুসলানদের শক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ'। কেন্দ্রীয় আইন সভার সবক'টি আসনে মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ বিজয়ী হন। প্রাদেশিক আইন সভায়ও ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টিতে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ জয়ী হন।

নির্বাচনের গণরায়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেই পাকিস্তান অর্জনের জন্য সর্বাধিক সংহতি ও সংকল্পের এবং অবিচল দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখনকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে এটিই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও তাদের অতুলনীয় সাফল্যের মূলে কাজ করেছে এদেশের জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমি এবং ইংরেজ ও তাদের প্রসাদভোগী হিন্দু মধ্যশ্রেণীর শোষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত এদেশের কৃষক-প্রজাদের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা। এদেশেই ইংরেজ শাসন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং শোষকশ্রেণীর সাক্ষাত প্রতিভূ হিসেবে ইংরেজদের চাইতেও তাদের দালাল হিন্দু জমিদারদের সাথেই পুরুষানুক্রমে মুসলমানদের মোকাবিলা হয়েছে। জমিদার ও সুদখোর মহাজনরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। আর মজলুম কৃষক-প্রজার অধিকাংশই মুসলমান। এই কৃষক-প্রজারা তাদের গর্দানকে জমিদার-মহাজনদের জুলুমের জিঞ্জীর থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সেই সাথে জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ঐতিহ্যে লালিত এই কৃষক-প্রজারা স্বপ্ন দেখেছিল দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত ইসলামী হুকুমত।

১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানগণ দু'শ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো শাসন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার গৌরবময় উপলব্ধি অর্জন করেন। এই শাসনামলে ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন' পাস হয়। ফলে বাংলাদেশে ষাট হাজার 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠিত হয়। এই বোর্ড মহাজনদের ঋণের দাবি ৯০০ কোটি টাকা থেকে ৬০ কোটিতে নামিয়ে আনে। মহাজনের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার ভবিষ্যত গ্যারান্টিরূপে কুসীদজীবী আইন পাস করে সুদী কারবারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন' পাস করে প্রজাদের ওপর জমিদারী স্বেচ্ছাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে কৃষকদের বুকের ওপর থেকে প্রায় দু'শ বছর চেপে থাকা জগদ্দল পাথরগুলো একের পর এক অপসারিত

হতে থাকে। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি এবং সরকারি চাকরিতে তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আমলে অনেকগুলো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্ব-শাসনের এই সুফলগুলো বাংলাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংকল্পের পক্ষে ইতিবাচকরূপে কাজ করে।

প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সোহরাওয়ার্দী কর্ম-সচিব নিযুক্ত হন। ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা ও সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং আলেম সমাজের ব্যাপক সামাজিক যোগাযোগ ও প্রচার অভিযান মুসলিম লীগের প্রতি জনসমর্থনের ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করে। গণজোয়ারের এই উত্তাল তরঙ্গের মুখে হিন্দু ও ইংরেজদের মিলিত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমিরূপে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বিশ্ব-মানচিত্রে অস্তিত্ব লাভ করে। গৌরবময় অতীতের আলোকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত রচনার লক্ষ্যে নিজস্ব জাতিসত্তার বুনিয়াদের ওপর স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি অর্জনের সুতীব্র প্রেরণাই জনগণকে ব্যাপকভাবে পাকিস্তান ইস্যুতে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

লাহোর প্রস্তাব থেকে দিল্লী প্রস্তাব

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল না। লাহোর প্রস্তাবের দু'টি দিক ছিল। এক. উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা, দুই. উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। এই প্রস্তাবের খবর পরিবেশন করতে গিয়ে হিন্দু সংবাদপত্রগুলোই এটাকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে উল্লেখ করে। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ এই নামকরণ মেনে নেয়।

১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লেজিসলেটর্স কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব আংশিক সংশোধন করে উপমহাদেশের দুই প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটিমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সে সময় উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু-ব্রিটিশ অশুভ আঁতাতের মোকাবিলায় বৃহত্তর মুসলিম সংহতির প্রয়োজনে এই সংশোধনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই প্রস্তাবের উত্থাপক।

বঙ্গভঙ্গের দাবি তুলল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস

মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে অবিচল দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করে। এ পটভূমিতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাগণ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও হিন্দু মহাসভার অন্যান্য নেতা ছিলেন বাংলাকে

ভাগ করার দাবির প্রথম উত্থাপক। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এ ব্যাপারে কংগ্রেস মহলও সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে যুক্তিতে তারা অখণ্ড ভারতের দাবিতে সোচ্চার ছিল, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার দাবি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার নামেই তারা ভারত-বিভক্তি রোধ করতে চেয়েছিল। আর সেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিই তাদেরকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মত সংকীর্ণ দাবির পথে টেনে নিয়ে গেল।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্তির দাবিকে চক্রান্তমূলক বলে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুসলমানগণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান, বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে তাদের আবাসভূমি ও জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করেছে। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হলে এ নীতিতে অন্যান্য প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। এ ধরনের বিভাজন প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলে আঘাতের শামিল হবে।

বাংলাদেশ বিভাগের জন্য হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে এই ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। অন্যদিকে পূর্ববাংলার কংগ্রেস নেতারা এ দাবি অযৌক্তিক বিবেচনা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াও এভাবে বিভক্ত ছিল। তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরা অখণ্ড বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে যে হিন্দু নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালে এসে তাঁরাই হলেন বাংলা বিভাগের অনমনীয় প্রবক্তা। অন্যদিকে ১৯০৫ সালে যে মুসলমান নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের কারণে খুশি হয়েছিলেন, তাঁরা ১৯৪৭ সালে ছিলেন বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে। এর পেছনে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করেছিল, সেটিই এদেশের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

মুসলিম লীগ : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা

উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের পটভূমিতে তখনকার বাংলাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অখণ্ডতা বজায় রেখে পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতারা বাংলাদেশকে বিভক্ত করার আন্দোলন শুরু করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই অখণ্ড বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দিল্লী প্রস্তাবের উপস্থাপক বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্ম-সচিব আবুল

হাশিম প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই বাংলাদেশ যোগ দেবে না। এটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম নেতাই সে সময়ে এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আইন সভার স্পীকার নূরুল আমীন ১৯৪৭ সালের ১৬ মার্চ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে বলেন :

> "আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম পূর্ব-পাকিস্তান হোক অথবা বঙ্গ-আসাম তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানরা এই স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন করবে। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা কেন্দ্রীয় সরকাররূপী কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করব না; আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারের ওপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না।" (ডন, ২৭ মার্চ, ১৯৪৭ ইন্ডিয়ান রেজিস্টার : ১ম খণ্ড, ১৯৪৭)

বাংলাদেশের মর্যাদা সম্পর্কে খাজা নাযিমউদ্দীন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল বলেন :

> "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তার হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীর সমস্বার্থের অনুকূল হবে এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হলে বাঙালিদের মারাত্মক ক্ষতি হবে।" (পূর্বোক্ত)

এর আগে ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ত্রিপুরা জেলার কিষাণপুরে এক জনসভায় বলেন, "মুসলমানরা অবশ্যই বাংলাদেশ পাবে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।" তিনি বাংলাদেশ ভাগ করার দাবির নিন্দা করে বলেন, "বাংলাদেশ বাঙালিদের এবং এটি অবিভাজ্য।" কিন্তু হিন্দু নেতাদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ বিভাগ অনিবার্য হড়ে পড়ার পর তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা করেন। ৮ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমি সব সময় অখণ্ড বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতি।" তিনি আশা করেন যে, বঙ্গভঙ্গের নতুন উদ্যোক্তারা নিজেদের নাক কাটার আগেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আন্তরিকভাবে মীমাংসায় আসার চেষ্টা করবেন। ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন :

> "হিন্দুগণ সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা নীতিগতভাবে মেনে নিলে আমি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বহু দূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছি।"

ড. শ্যামাপ্রসাদসহ কয়েকজন হিন্দু নেতা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন। তার জবাবে সোহরাওয়ার্দী ৭ মে এক বিবৃতিতে মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের যুক্ত বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন।

তিনি এই চমৎকার সুযোগ নষ্ট না করার আবেদন জানিয়ে বলেন :

> "বাংলাদেশ (অখণ্ডরূপে) স্বাধীন না হলে বাংলার হিন্দুদের বিশেষ মর্যাদা থাকবে না। (ভারতে) তাদের ভাষা ও কৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশকে শোষণ করবে।" (ডন, ৯ মে, ১৯৪৭)

সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও বগুড়ার মুহাম্মদ আলী ১২ মে সোদপুর আশ্রমে গান্ধীর সাথে দেখা করে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৪ ও ১৫ মে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর সাথে দিল্লীতে আলোচনা করেন। তিনি ১৬ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দেন যে, অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রতি মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের সমর্থন রয়েছে।

এ সময় মওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও আবুল হাশিম কর্ম সচিব ছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপস মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি একটি সাব কমিটি গঠন করে। এই কমিটি কংগ্রেস নেতাদের সাথে কয়েকটি যুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত সভায় দুই দলের এক যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী, নাযিমউদ্দিন, আবুল হাশিম, ডাঃ এ এম আবদুল মালিক, ফজলুর রহমান ও অপর একজন মুসলিম লীগ নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় ও অপর চার জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এই যুক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটিকে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। ২০ মে শরৎ বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় যুক্ত কমিটির সদস্যরা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২৩ মে শরৎ বসু গান্ধীকে একটি চিঠি লিখে এ চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন।

'কীটদষ্ট ও সঙ্কুচিত' পাকিস্তান

কংগ্রেস অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শরৎ বসুকে ৮ জুন লিখিত এক চিঠিতে গান্ধী জানিয়ে দেন যে, তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে নেহেরু ও প্যাটেলের সাথে আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতি তাঁদের সম্মতি নেই। গান্ধী শরৎ বসুকে তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করে বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা হতে বিরত থাকার উপদেশ দেন। এভাবেই স্বাধীন অখণ্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারত বিভাগের সাথে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক অনন্যোপায় ব্যবস্থা হিসেবে তা মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ সালের ৯ জুন দিল্লীতে ইম্পেরিয়েল হোটেলে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিভক্তি স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তান-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়। মওলানা আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দী, নাজিমউদ্দিন ও আবুল হাশিমসহ বাংলাদেশের ষাট জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন।

মুসলিম লীগ পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ২০ জুন যে বিবৃতি দেন তার এক স্থানে তিনি বলেন :

> "পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাদের অধিকার ও স্বার্থ কোন রকমকেই বিপন্ন হবে না। মুসলিম জগত তাদের নিকট থেকে এত বেশী দূরে নয় যে, সেখানে তাদের আওয়াজ পৌঁছবে না এবং সেখান থেকে তাদের কাছে সাহায্য আসবে না।" (ডন, ১১ জুন, ১৯৪৭)

খণ্ডিত বাংলাদেশ ও খণ্ডিত পাঞ্জাব নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষায় 'কীটদষ্ট ও সংকীর্ণ' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই হলো পটভূমি।

ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলায় জাগরণের ধারা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার জাতীয় জীবন নতুন আশা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নব-নির্মাণের আনন্দ-উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন দেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-গায়ক-শিল্পী-ক্রীড়াবিদ তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষ। বলা চলে একবারে শূন্য থেকে শুরু হয় এ নবনির্মাণের আয়োজন। দু'শ বছর কলকাতাকেন্দ্রিক 'টাওয়ার বাংলা'র শোষণ ও লুণ্ঠনক্ষেত্ররূপে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলা একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়েছিল। অফিস আদালত, পার্লামেন্ট বসানোর জন্য ভবন নেই। টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত নেই। কিন্তু কোন কিছুই দমিয়ে দিতে পারল না সেই প্রেরণা। পিন-আলপিনের বদলে বাবলা কাঁটায় কাগজ জুড়ে দিয়ে কাজ এগিয়ে চলল।

সাতচল্লিশের আগে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলা করে ১৯২১ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর কোন এফিলিয়েটিং মর্যাদা ছিল না। এফিলিয়েটিং মর্যাদা না দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত পঙ্গু করে রাখা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৪৭ সালের এক সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ববাংলার সকল কলেজ অধিভুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে পূর্ববাংলার কৃষক-মুসলমান পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার ভরকেন্দ্র রাতারাতি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ সালে মোমেনশাহী কৃষি বিশ্বদ্যালয় ও ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৭০ সালে

জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সংশ্লিষ্ট দুটি বিভাগের কলেজগুলো যথাক্রমে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাহশাহী, সিলেট, বরিশাল ও মোমনশাহীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে। ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদরাসা, পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলেই পূর্ববাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সময় নবযুগের প্রবর্তন হলো এবং নবচেতনার জাগরণ ঘটলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা থেকে মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সঙ্গীতশিল্পীগণ ঢাকায় চলে আসেন। পূর্ববাংলার জীবনপ্রবাহে এ সময় নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় 'এগ্রিকালচার'-এর সাথে 'কালচার' তখন থেকেই সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের আগে বাংলাভাষী অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিকশিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট নগর-কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকাকে ঘিরে। দুই শতাব্দীর মধ্যবিত্তের উত্তরাধিকার নিয়ে কলকাতা ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি পরিণত ঐতিহ্যের অধিকারী। এখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠল সাহিত্য-সংস্কৃতির এক নতুন বদ্বীপ। নাটকে-উপন্যাসে-সঙ্গীতে-কবিতায় সে ভুবন দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

আগে শিল্প-অর্থনীতির যা-কিছু বিকাশ ঘটেছিল, সবই কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এখন ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার 'খামার বাড়ী'তেও গড়ে উঠতে লাগল পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল, কাগজকলসহ নানা কলকারকানা। স্বর্ণসূত্র নামে অভিহিত পাটের প্রধান উৎপাদক এলাকা হিসেবে গর্বিত পূর্ববাংলায় সাতচল্লিশের আগে একটিও পাটকল ছিল না। পূর্ববাংলার কৃষকরা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক 'টাওয়ার বাংলা'র পাটকলগুলোর কাঁচামালের যোগানদার। স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জনের মাধ্যমেই তারা পাটকল প্রতিষ্ঠারও অধিকার অর্জন করল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই এখানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পেরও বিকাশ ঘটল। এ সম্পর্কে শামসুল হক লিখেছেন :

> "মুদ্রণ ও প্রকাশনাক্ষেত্রে কলকাতা ১৭৭৮ থেকে যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, সে ঐতিহ্য ঢাকার ছিল না। এক্ষেত্রে ঢাকা ছিল প্রায় অবহেলিত। মফস্বল শহরের দীনতার মধ্যে সে যতটুকু নিজেকে সাজাতে পেরেছিল, তার বেশি কিছু ছিল না। ...... যাও বা ছিল, তাদের অনেকেই দেশ বিভাগের পর কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিল। প্রকাশকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। প্রেসের মতো এরাও পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেন ইন্ডিয়া।" (বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ৩৮৭)

এই শূন্যতা পূরণের জন্য মেতে উঠল ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রজন্ম। মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হলো নতুন জাগরণ। ফলে কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ-সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখানে উন্মোচিত হলো নবযুগের নতুন দিগন্ত। ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জাগরণ ঘটলো এবং তাদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটলো সহস্রধারায়। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণ-ফসল বাংলা একাডেমি ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার রেনেসাঁ একটি সংহত রূপ লাভ করল।

অন্নদাশংকর রায় ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার এই জাগরণকেই 'দ্বিতীয় রেনেসাঁ' বলে উল্লেখ করে লিখেছেন :

> "এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁস বলে ঠিক করেছি বা ভুল করেছি, সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ববাংলা– এখন তো বাংলাদেশ– নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁয় নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তারা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁসের ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এর পূর্বাভাস পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে।" (বাংলার রেনেসাঁস, ভূমিকা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৪)

১৩.
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

মুসলিম লীগ ছিল জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু পরস্পরবিরোধী শক্তির একটি জাতীয় ঐক্যমঞ্চ বা জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। পাকিস্তান অর্জনের পর সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে এই দল বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মুহাজির পাকিস্তানে আগমনের ফলে সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তীব্র হয়। মুসলিম লীগের মতো একটি অসংগঠিত আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এই সংকট মুকাবিলা অসম্ভব বিবেচনা করেন জিন্নাহ। তিনি বৃটিশ-ভারতের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাইস রিগাল সিস্টেমের অধীনে গর্ভনর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। এখান থেকেই পাকিস্তানের সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিতে আমলাতন্ত্র সর্বাধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সূচনা হয়।

দলের সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে জিন্নাহ হলেন গভর্নর জেনারেল। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের 'দুর্বল কাঁধে' ন্যস্ত হয় সংগঠনের দায়িত্ব। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দলের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী রচনা করা হয় করাচীতে অনুষ্ঠিত গোপন কাউন্সিল সভায়। গভর্নর জেনারেলের সরকারি ভবন থেকে প্রেসনোট আকারে দলের নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রচার করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত লীগের প্রধান সিদ্ধান্তকারী সংস্থা 'কনভেনশন' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দশ বছরেও কোন বৈঠকে মিলিত হয়নি। দলের নির্বাচিত নীতিনির্ধারণী সংস্থা কাউন্সিল প্রথম নয় বছরে মাত্র সাতটি বৈঠকে মিলিত হয়। সরকারি অনুমোদন পাবে না এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপনের সাহস দলের ওয়ার্কিং কমিটির ছিল না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত 'কনসেম্বলী' স্বৈরাচারী উপায়ে বিলুপ্ত হওয়ার আগে চার বছরে মাত্র চারটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রচারসর্বস্ব কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এক বিরাট প্রভাবশালী অংশের পাকিস্তানী এলাকায় কোন নির্বাচনী এলাকা ছিল না। ফলে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ থেকে আগত ব্যক্তিগত প্রভাব-নির্ভর এসব ত্যাগী নেতার অনেকেই

সাধারণ নির্বাচনের গণ-রাজনীতির চাইতে প্রাসাদ-রাজনীতিতে বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

দলীয় কাউন্সিল ও জিন্নাহর নীতি লংঘন করে একশ্রেণীর নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম লীগকে দেশের একক জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে প্রচার করেন। 'মুসলিম লীগের বিরোধিতা মানেই পাকিস্তানের বিরোধিতা' এবং 'পাকিস্তানের বিরোধিতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা'– এমন একটি ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস একশ্রেণীর মুসলিম লীগারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম লীগের সরকার দল ও দেশবাসীর কাছে দায়িত্বশীল হতে পারেনি। ফলে দলের মাধ্যমে জনগণের দাবি সমর্থিত হওয়ার সুযোগ রহিত হয়। জনগণের সাথে দলের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে দলীয় কাঠামোর মাধ্যমে জনমত উপলব্ধি করার সুযোগ বন্ধ হয়। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা রাষ্ট্রভাষার মতো সংবেদনশীল ইস্যুতেও দায়িত্বহীন অর্বাচীনসুলভ আচরণ করেন।

গরমিলের রাজনীতি : শ্লোগান বনাম বাস্তবতা

একশ্রেণীর নেতা পূর্ববাংলায় দলের রশীদ বই বগলদাবা করে মুসলিম লীগের দরজা 'জনগণের মুখের ওপর' বন্ধ করে দেন। বস্তুত মুসলিম লীগের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করা হয়। এর ফল হিসেবেই পূর্ববাংলা থেকে শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' বা জনগণের মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

বিরোধী মতের লোকদের সাথে আচরণে মুসলিম লীগারদের দায়িত্বহীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মত পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদেরকে 'দেশদ্রোহী' ও 'বিদেশী চর' আখ্যা দেওয়া হয়। ফলে দেশের আসল শত্রুরা উৎসাহিত হয়। বহু রাজনৈতিক কর্মীকে রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের কারণে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে জেলে ঢুকানো হয়। জেলের ভেতর তাঁরা সত্যিকার কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে সবক নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

দলের ভেতর পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী-স্বার্থ ও আঞ্চলিক-স্বার্থের সমন্বয় বিধান ও আর্টিকুলেট করতে মুসলিম লীগ নেতাগণ ব্যর্থ হন। বছরে দুই আনা চাঁদা দিয়ে 'পাকিস্তান মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণে'র ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী লাখ লাখ সদস্যকে প্রতিশ্রুত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের নির্মাতারূপে গড়ে তোলার কোন কর্মসূচিই মুসলিম লীগের ছিল না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের সাথে ইসলামী আদর্শবাদের সমন্বয় না ঘটায় দলের নেতা ও কর্মীদের কথা ও কাজে বিরাট গরমিল দেখা দেয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র ও ইসলামী জীবনবিধান কায়েম, সংখ্যালঘুদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা প্রভৃতি শ্লোগানধর্মী কথাবার্তা মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। কিন্তু জনগণের

মৌলিক সমস্যা সমাধানে কোন কর্মসূচি তারা পেশ করেনি। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে জনগণকে উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ করলেও ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের কোন কর্মসূচি কিংবা এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণাও তাদের ছিল না।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি ১৯২৭ সালেই ভারতের জন্য শাসনতন্ত্রের একটি ব্লুপ্রিন্ট প্রণয়ন করেছিল। অন্যদিকে 'আল কুরআনই হবে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র' এই জননন্দিত স্লোগান ছাড়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের কোন নকশা মুসলিম লীগের হাতে ছিল না। শিক্ষাব্যবস্থাকে 'হিন্দু-ভারত' প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে ঢেলে সাজানোর জন্য কংগ্রেস বহু আগেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে 'ওয়ার্ধা স্কীম' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসারে ভবিষ্যত নাগরিক সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের কোন চিন্তা-ভাবনা মুসলিম লীগ করেছে বলে জানা যায় না। কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীনতার আগেই ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র বছরখানেক আগে লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে গঠিত লক্ষ্য-বঞ্চিত অর্থনৈতিক কমিটি স্বাধীনতার পরও অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দূরে থাক, একটি উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি।

পশ্চিম-পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামোগত কারণে মুসলিম লীগ সকল দুর্বলতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও কিছু বেশি সময় সেখানে রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের পটভূমি ভিন্ন হওয়ার কারণে উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের মধ্য দিয়ে এখানকার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক সচেতনতা ও উচ্চাভিলাষে অগ্রসর ছিল। তাদের দাবি সমর্থন ও পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মুসলিম লীগের সাথে এই শ্রেণীটির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের অবসান ঘটে। পূর্বাঞ্চলে নির্বাচনী পরাজয় এবং পশ্চিমাঞ্চলে সামন্ত অভিজাতদের দ্বারা ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। ফলে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমউদ্দীনকে অপসারণ ও আইন পরিষদ বাতিল করা সম্ভব হয়।

স্বাধীনতার পর দলের পুনর্গঠন কর্মসূচিকে গুরত্বদানে ব্যর্থতা এবং সুসংহত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতীয়ভিত্তিক ও গণভিত্তিক দলরূপে গড়ে ওঠার ব্যর্থতা স্বাধীনতা আনয়নকারী মুসলিম লীগের সকল কৃতিত্ব ম্লান করে দেয়। দলের ভেতরে নিজস্ব আদর্শভিত্তিক সিস্টেম চালু করতে না পারার দরুন মুসলিম লীগের কর্মী ও নেতারা ডান, বাম, চরম ও নরম ধারায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। নেতা হওয়ার লোভে বহু জাঁদরেল কর্মী সেক্যুলার পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েন। নানা রাজনৈতিক উপ সংস্কৃতির ধারক মুসলিম লীগের ভেতর থেকে বহু রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আদর্শিক বা

রাজনৈতিক প্রতিরক্ষার কোন ধারা অনুসৃত না হওয়ায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে জাতিসত্তার সুরক্ষায় এবং পরিচর্যা ও বিকাশদানে এই দল ব্যর্থ হয়। তাদের আদর্শিক বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ বিলম্বিত করে। ফলে পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার পথ প্রশস্ত হয়। মুসলিম লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যর্থতাই দেশে সামরিক শাসন ডেকে আনে। স্বৈরাচারের দশক পাড়ি দিয়ে জাতি মুসলিম লীগের ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে দ্রুত বিচ্ছিন্নতার পথে অগ্রসর হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র সে বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তিকেন্দ্র বাংলাদেশ সিকি শতকেরও কম সময়ের ব্যবধানে নয় মাস স্থায়ী রক্তক্ষয়ী জন-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানরা পৃথক স্বাধীন দেশ কায়েম করে মুসলিম জাতি-স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক লাহোর প্রস্তাবের মূল কাঠামোতে প্রত্যাবর্তন করে।

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে হঠকারিতা

পাকিস্তানী শাসকগণ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে দেশের জনগণের ওপর যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার জনগণের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত এক পর্বতপ্রমাণ ভুল। তাদের ভুল সিদ্ধান্ত পূর্ববাংলার জনমানসে এক চরম নেতিবাচক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

এই এলাকার জনগণের অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের সকল সংগ্রামে ভাষার প্রশ্নটি সব সময়ই বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী এই এলাকার সমাজ-সভ্যতার বিকাশধারাকে রুদ্ধ করার জন্য জনগণের মুখের ভাষাকে প্রভাবহীন ও বিকল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এ পটভূমিতে বাংলার মানুষের ভাষার লড়াই তাদের ভাষার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষার এই লড়াইকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তুলনা করেছেন 'অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যকার রাজনৈতিক লড়াই'য়ের সাথে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার গণতন্ত্রী জনগণের বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগণ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নের যে মুর্খতাপ্রসূত রায় দিলেন, তা এ এলাকার জনগণের কাছে গণতন্ত্রের পরাভবরূপে চিহ্নিত হয়।

কুড়ি শতকের সূচনাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলে অঞ্চল নির্বিশেষে সারা ভারতের হিন্দুরা হিন্দির পক্ষে মত দিয়েছিল। অন্যদিকে এক মাত্র বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের মুসলমানরাই ছিল উর্দুর পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮ সালে গান্ধীকে লেখা চিঠিতে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দির পক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। আর একই বছর বিশ্ব-ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন :

> "শুধু ভারত কেন সমস্ত এশিয়া মহাদেশেই বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চ। ভাব-সম্পদ ও সাহিত্যগুণে বাংলাভাষা এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয়।"

উর্দু-হিন্দি-বাংলা ভাষার বিতর্কে কংগ্রেসের সব নেতাই এক বাক্যে হিন্দির পক্ষে রায় দেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯২১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করেন পূর্ববাংলার জননন্দিত নায়ক সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। দাবিনামায় তিনি বলেন, "ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।" এরপর ১৯৩৭ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র দৈনিক আজাদের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেন :

> "সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষার বিবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের সংখ্যাই বেশি। অতএব বাংলা সব দিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষার চেয়ে হিন্দির যোগ্যতা কোন দিক দিয়াই বেশি নহে।"

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয় তার মূলেও তাদের নিজস্ব ভাষার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে কলকাতায় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও ঢাকায় 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ সংগঠিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। বাংলার মুসলিম জনগণের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চাইতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিষয়টি এতটুকু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এ কারণে বাংলার জনগণের পাকিস্তান আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ছিল অধিক শক্তিশালী। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ এলাকার মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন : 'রাজনৈতিক পাকিস্তানের জন্ম যদি কোন কারণে নাও হয়, সাংস্কৃতিক পাকিস্তানের জন্ম হতেই হবে।'

এ পটভূমিতেই বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তাদের ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার আদায়ের লড়াই পরস্পর হাত ধরাধরি করে এগিয়েছিল।

এ পটভূমি সামনে রাখলে পাকিস্তানী শাসকগণ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কোনরূপ হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে বাংলাদেশের অবদান ছিল সর্বাধিক। চল্লিশের লাহোর প্রস্তাব ও ছেচল্লিশের দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপনকারীরূপেও গৌরবের হকদার ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জনগণের মুখের ভাষার অধিকার

প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী অবকাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি জোরদার করারই একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশই ইংরেজদের কাছে প্রথম পদানত হয়েছিল এবং ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের মানুষকে দীর্ঘকাল জড়িত থাকতে হয়েছে। ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের সর্বাধিক শোষণের শিকার এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে মূল চালিকাশক্তিরূপে ভূমিকা পালন করেছে। তারাই ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। তা সত্ত্বেও এলাকার জনগণের মুখের ভাষার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে, তা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতির প্রশ্নে এক পর্বতপ্রমাণ ভুলরূপে প্রমাণিত হয়। ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানী শাসকদের চিন্তা শুধু ভুলপ্রসূত ছিল না, তার চেয়ে বেশি ছিল স্থূল মানসিকতা প্রসূত।

তাদের এই স্থূল চিন্তার একটি দিক উন্মোচিত করে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর সংখ্যা 'কৃষ্টি' পত্রিকায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তা থেকে মনে হয়, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কারূপে উর্দুকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানী নামক কৃত্রিম হিন্দি ভাষাকে বহুভাষী হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করেন। এর প্রতিবাদে ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন :

> "কংগ্রেসের অনুকরণে মুসলিম লীগও উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার একটি প্রবল বাসনা পোষণ করিতেছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। যদি এই কারণে পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দুকে প্রচলিত করিবার আয়োজন চলিতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে আমরা এখনো অপরের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিবার উপযুক্ত হই নাই।"

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাদের কারো ভাষাই উর্দু ছিল না। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দু লিখতে কিংবা পড়তেও জানতেন না। পাকিস্তানের মাত্র দুই ভাগ লোকের ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র পাকিস্তানের জন্য লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কারূপে এই ভাষাকে গড়ে তোলার ইচ্ছা 'জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে' কারো কারো ছিল। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা এটাকে তাদের জীবনীশক্তির ওপর আঘাতরূপে গণ্য করেন।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাষার প্রশ্নে যেকোন হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে তমদ্দুন মজলিস প্রচারিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা' শীর্ষক পুস্তিকায় একটি প্রবন্ধে বলা হয় :

> "বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশঙ্কা

> আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতি সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।"

পাকিস্তানী তদানীন্তন শাসকগণও এ ধরনের হুশিয়ারীর প্রতি কর্ণপাত করেননি। উর্দু ভাষার বিকাশে মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদান এবং উর্দু ভাষা ইসলামী উপাদানে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের উর্দুর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই শ্রদ্ধাশীলতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে শাসকগণ তৎকালীন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের মুদ্রা, মানিঅর্ডার ফরম, ডাকটিকেট ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে ইংরেজির পাশাপাশি শুধু উর্দু ব্যবহারের আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইংরেজ সচিব মি. গুডইউন স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার বিষয়সূচিতে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, উর্দু, হিন্দি, এমনকি সংস্কৃত ও ল্যাটিনের মতো মৃত ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। শুধু ছিল না পাকিস্তানের মেজরিটি জনগণের মাতৃভাষা বাংলা। এ ধরনের অবহেলার প্রতিবাদে ভাষার প্রশ্নে বিক্ষোভ দ্রুত ধূমায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকগণ দুই পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের বিষয়টি স্মরণ রাখলেও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এরূপ অবাস্তব ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ লাহোর প্রস্তাবের বাস্তব দিকটি বুঝতে যেমনি ভুল করেছেন, একইভাবে তাঁরা আরেকটি বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করেছেন। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাগরণের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রের জন্ম, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের উত্তরসুরী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসুরী ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এক অলিখিত আঁতাতে আবদ্ধ ছিল গোড়া থেকেই। দেশ বিভাগের র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটেছিল। এই ষড়যন্ত্র মুকাবিলা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সমুত্থিত দাবির মীমাংসা করার জন্য যে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও সাবধানতা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশত রাষ্ট্রনায়কোচিত সেসব গুণ শাসকদের ছিল না। অথচ ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব এমনকি তৎকালীন সংগ্রামী ছাত্রসমাজও এদিক থেকে অনেক বেশি সজাগ ও সচেতন ছিলেন।

১৯৫১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ' প্রচারিত ইশতেহারটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এ ইশতেহারে বলা হয় :

> "পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। উর্দুর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নাই। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা প্রচলন নাও থাকতো, তাও আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন করতাম। কারণ পাকিস্তানের উন্নতি, পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেবল বাঞ্ছনীয়ই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে পাকিস্তানকে সবল করা আজ যুব সমাজের কর্তব্য। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ জাতিকে দুর্বল করা। আমরা আজ দুর্বল হতে চাই না, চাই সবল হতে। তাই বন্ধুগণ, পাকিস্তানকে সবল করতে হলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনারা এই মহৎ কর্তব্যে এগিয়ে আসুন। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিন, বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে পাকিস্তানের অনিষ্ট করা হবে।”

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার দাবি শুধু উপেক্ষাই করা হয়নি, এই আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কারসাজি বলেও অপব্যাখ্যা করা হয়। অথচ বাংলা ভাষার এই আন্দোলন ছিল স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেমপ্রসূত। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত উদার ও সহনশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল :

“বাংলাকে উর্দুর সাথে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অফিস আদালত ও শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে বাংলা ভাষা।” ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগানগুলোর অন্যতম ছিল : 'বাংলা উর্দু ভাই ভাই, উর্দু'র পাশে বাংলা চাই'। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দু বাংলায় বিরোধ নাই'।

জনগণের এই উদার ও নমনীয় দাবির ভাষা বুঝতে শাসকগণ ভুল করলেন। যুক্তির ওপর হঠকারিতা প্রাধান্য পেল। ফলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালো মেঘ আচ্ছন্ন করল সব কিছুকে। এরপর দাবি উঠল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নইলে বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথ রক্তাক্ত হলো। সেই রক্ত-পিচ্ছিল পথ গিয়ে ঠেকলো স্বাধীনতায়। বাংলাভাষা বাংলাদেশী জনগণের প্রতিনিধিত্বে ঠাঁই পেল বিশ্বসভায়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বাংলা ভাষার রাজধানীরূপেও গৌরব অর্জন করল।

জাতীয় সংহতির সংকট

জাতীয় সংহতি সংরক্ষণে পাকিস্তানের ব্যর্থতা এশিয়া ও আফ্রিকার নব্য স্বাধীন দেশগুলোর ইতিহাসে একটি চিহ্নিত ঘটনা। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা জাতিগঠনে পাকিস্তানের ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির জটিল সমস্যা পাকিস্তানী শাসকদের সামগ্রিক ব্যর্থতার কারণে সমাধানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অভিন্ন মুসলিম জাতিসত্তার যে অন্তর্গত প্রেরণা হাজার মাইলের দূরত্বে অবস্থিত দু'টি অসংবদ্ধ ও অসমান অঞ্চলের জনগণকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, সে প্রেরণাকে জাতিগঠনের কাজে নিয়োজিত করতে পাকিস্তানের শাসকগণ সক্ষম হননি। একটি জাতীয় ভূখণ্ডগত মনোভাব সৃষ্টি কিংবা কেন্দ্রীয় জাতীয়

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হন। 'এলিট' ও 'মাস' বা সুবিধাভোগীশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব নিরসন এবং ন্যূনতম জাতীয় মূল্যবোধ সচেতনতার বিকাশ ঘটাতেও তাঁরা পারেননি। সর্বোপরি জাতীয় ঐক্যের প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণগত মূল সূত্রগুলোকে তাঁরা শুধু সস্তা শ্লোগান হিসেবে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। জাতীয় জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করেননি। জাতি গঠনের এই মূলনীতিগুলোর প্রায়োগিক ব্যর্থতা পাকিস্তানকে জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে সুসংগতরূপে গড়ে উঠতে দেয়নি।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির সংকটের কারণগুলোকে মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে দেখা যেতে পারে :

ক. পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে মুসলিম লীগ একক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর পাকিস্তানকে একমাত্র মুসলিম লীগের সম্পত্তি মনে করার কারণে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানা হয়।

খ. সুসংহত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভাবে দেশের সমগ্র জনগণের সকল স্বার্থের সমন্বয়কারী জাতীয়ভিত্তিক ও গণভিত্তিক সংহত রাজনৈতিক দলের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

গ. একটি নবীন রাষ্ট্রের জন্য মৌল ও অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে শাসনতন্ত্র। অথচ স্বাধীনতার পর নয় বছরেও নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র লাভে জাতি ব্যর্থ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একটা শাসনতন্ত্র রচিত হলেও তাকে বাস্তবে স্থিতিশীলতা দান করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতা জাতীয় সংহতির পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ. জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণে কালক্ষেপন করা হয়। ফলে আদর্শিক কোন্দল চরম রূপ নেয়। Common set of cultural values বা সমন্বিত সাংস্কৃতিক মনন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসময়োচিত ও বিভ্রান্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা হয়।

ঙ. পূর্ব থেকে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য অবসানের যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভ্রান্ত অর্থনীতির ফলে দেশের পশ্চিম ও পুব অঞ্চলে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়।

চ. প্রতিনিধিত্বমূলক উপায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সব অঞ্চলের সর্বস্তরের জনগণের ক্ষমতা বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ না দিয়ে আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে প্রশাসনের চরম কেন্দ্রীয়করণ করা হয়। দেশের সামাজিক প্রক্রিয়ায় সরকারি ভূমিকার বিস্তার ঘটানো হয়।

ছ. রাষ্ট্রগঠন তৎপরতার পাশাপাশি জাতিগঠন তথা জাতিসত্তার পরিচর্যা ও বিকাশদানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়।

ড. রওনক জাহানের ভাষায় বলা যায় , "The failure to develop adequate nation building policies inspite of success in other sectors, endangered the viability of the state". (Pakistan : Failure in National Integration.)

গরমিলের রাজনীতির প্রথম দশক

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'জিয়ারত' নামক এক দুর্গম স্থানে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর পূর্ববাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান। মোহাজির লিয়াকত আলী খান পাঞ্জাবী আমলাচক্রের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। ১৯৫১ সালে এই পাঞ্জাবী আমলা চক্রের সহায়তায় আইয়ুব খান কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তার কিছুদিন পর ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারান। লিয়াকত আলীর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন। গভর্নর জেনারেল হন গোলাম মোহাম্মদ। গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল খাজা নাজিমউদ্দীনকে পদচ্যুত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেরেবাংলা-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী-আতাহার আলীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করা হয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনে 'একুশ দফা' ভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার এক প্রবল তুফান সৃষ্টি করে। হঠকারী মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ৩০৯ আসনের পরিষদে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি ও মুসলিম লীগ মাত্র দশটি আসন পায়। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। শপথ অনুষ্ঠানের দিনেই আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে গভর্নর হাউসের গেটে স্লোগান দেয়। যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদলগুলোর মধ্যে শুরু থেকেই সমঝোতার পরিবর্তে বিভেদ দানা বেঁধে ওঠে। এই সুযোগে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২-ক ধারার অধীনে গভর্নরের শাসন জারি করেন। একই দিনে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ববাংলার গভর্নররূপে প্রবীন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৫৪ সালের ৪ অক্টোবর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া ও স্যার জাফরউল্লাহ খানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। পথে তিনি লন্ডনের এক হোটেলে বসে পাকিস্তানের ভবিষ্যত রাজনীতির একটি ছক তৈরি করেন, তাতে

পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলো ভেঙে দিয়ে এক ইউনিট করে পূর্ব-পাকিস্তানকেও আরেকটি ইউনিট ধরে সংখ্যাসাম্য নীতির পরিকল্পনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সফর শেষ করে তারা দেশে ফেরার পরই ২৪ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। মোহাম্মদ আলী বগুড়া নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। জেনারেল আইয়ুব খান ও ইস্কান্দার মীর্জা এই মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দফতরে নিযুক্ত হন। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান 'সিয়াটোর' অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরের বছর 'সেন্টো' ও বাগদাদ চুক্তির অংশীদাররূপে পাকিস্তান পুরোপুরি মার্কিন সামরিক পরিকল্পনার অধীন হয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্টের শরিক দল আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির দলাদলি প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালের ১৪ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা সফরে এলে বিমানবন্দরে তাকে মাল্যদানের জন্য আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা হয়। ১১ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী দেশে ফিরে এসে ২০ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। সোহরাওয়ার্দী এ সময় গণপরিষদের পরিবর্তে 'কনভেনশন'-এর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রস্তাব দিলে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের সভায় আওয়ামী লীগ ফজলুল হকের সংসদীয় নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনে। ফলে তীব্র বাদানুবাদ, হৈচৈ এবং দুই দলের আলাদা আলাদা বিজয়ের ঘোষণার মধ্য দিয়ে সভাটি পণ্ড হয়ে যায়। দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে পারস্পরিক সমঝোতার পরিবর্তে বিভেদমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের এক বিরাট প্রত্যাশাকে কবর দেওয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি পার্টির এটিই ছিল শেষ যৌথ সভা। এরপর কার্যত যুক্তফ্রন্টের মৃত্যু হলো।

১৯৫৫ সালের ৩ জুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া ঢাকা এসে সোহরাওয়ার্দী ও হক সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনার পর ৯২-ক ধারা শীঘ্রই প্রত্যাহার এবং ফজলুল হক সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা করেন। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের নতুন গণপরিষদ গঠন করা হলো। ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর জেনারেল এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ববাংলায় আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টির মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন করে দলের 'অসাম্প্রদায়িক' চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি নতুন গণ পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করে। ২ মার্চ গভর্নর জেনারেল নতুন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ২৩ মার্চ থেকে তা বলবৎ হয়। শাসনতন্ত্রে 'পূর্ববাংলা' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব-পাকিস্তান' রাখা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশ একীভূত করে এক ইউনিটের ভিত্তিতে 'পশ্চিম-পাকিস্তান' নাম রাখা হয়।

দুই প্রদেশের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতি প্রবর্তন করা হয়। বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়।

১৯৫৬ সালের ৯ মার্চ শেরে বাংলা ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে খাদ্যের দাবিতে অনুষ্ঠিত ভুখা মিছিলে গুলী চলে। ফলে গভর্নর ফজলুল হক ও তাঁর দলের আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সংকটে পড়ে। ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গভর্নর ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। কেন্দ্রেও রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন ও ইস্কান্দার মীর্জার গোপন হস্তক্ষেপে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে আওয়ামী লীগের মধ্যকার ডান ও বামপন্থি দুটি গ্রুপের বিরোধ স্পষ্ট আকার লাভ করে। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে দলের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। সোহরাওয়ার্দী এ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বামপন্থি গ্রুপ সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্য ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে আওয়ামী লীগে সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর নেতৃত্বাধীন দুই গ্রুপের অন্তর্বিরোধ তীব্র মারমুখো আকার ধারণ করে। কাগমারী সম্মেলনেই মাওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ইতিহাসখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন।

এরপর ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভাসানী গ্রুপ ও সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের বিরোধ হাতাহাতির রূপ লাভ করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের 'তরুণতুর্কিরা' ভাসানী গ্রুপের কয়েকজন সদস্যকে পিটিয়ে আহত করে। এ অবস্থায় মাওলানা ভাসানী বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেন। ২৭ জুলাই পুরনো ঢাকার একটি সিনেমা হলে অধিবেশন ডেকে তিনি 'পূর্ব-পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন করেন। তাঁর দলে আওয়ামী মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত জনা তিরিশেক পরিষদ সদস্য ছিলেন।

আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তির ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেন্দ্রে ইসকান্দার মীর্জার নতুন চালে ১৯৫৭ সালের ১০ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন মুসলিম লীগের আই আই চুন্দ্রীগড়। এর মাত্র ৫৯ দিন পর ১৬ ডিসেম্বর চুন্দ্রীগড়ের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে রিপাবলিকান পার্টির ফিরোজ খান নুনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ফিরোজ খান নুন ১৯৫৬ সালের

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

গরমিলের রাজনীতি : দ্বিতীয় দশক

পূর্ব-পাকিস্তান কেএসপি প্রাদেশিক পরিষদে শক্তির ভারসাম্য ফিরে পেয়ে আতাউর রহমান খানের প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টা চালায়। আতাউর রহমান খান গভর্নরকে পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবু হোসেন সরকার নিজে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করে সরকার গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ গভর্নর ফজলুল হক আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। একই তারিখে আবু হোসেন সরকারকে গভর্নর হাউসে শপথ পাঠ করানোর পরপরই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ফজলুল হককে বরখাস্ত করেন। মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে আবূ হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকেও বরখাস্ত করা হয়। আতাউর রহমান খান আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

বস্তুত যুক্তফ্রন্টের এই দুই শরিকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি এ সময় এক নাজুক অবস্থায় দাঁড়ায়। ১৯৫৮ সালের ১৩ জুন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে সংখ্যালঘু ও 'ন্যাপ' দলীয় সদস্যরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। কিন্তু ১৮ জুনের অধিবেশনে ন্যাপ সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে আওয়ামী লীগের সরকার ১২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। ২০ জুন আবু হোসেন সরকার যখন আবার মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন, তখন খবর রটে যায় যে, ন্যাপ সদস্যরা পুনরায় আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তিন দিন পর ২৩ জুন পরিষদের অধিবেশন বসে। আওয়ামী লীগ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। ন্যাপ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। ১৪ ভোটের ব্যবধানে তিন দিনের মাথায় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার আবার পতন ঘটে।

এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা প্রয়োগ করে পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করেন। গভর্নরকে তিনি সকল দলের পরিষদ সদস্যদের তালিকা কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তখনকার পরিস্থিতির চিত্র পাওয়া যায় মেজর (অব) এস জি জিলানীর বিবরণীতে। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের ১৫ জন গভর্নরের এডিসি হিসেবে দীর্ঘ দিন গভর্নর হাউসে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেজর জিলানী তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে লিখেছেন :

> "আওয়ামী লীগ এবং কে. এস. পি বিতর্কিত সদস্যদের মধ্য থেকে তাদের একেকজনকে তাদের দলের সমর্থক প্রমাণ করার জন্য গভর্নর হাউসে নিয়ে আসতে লাগল। একদিন কেএসপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস মি. আলী নামে একজন সদস্যকে গভর্নর হাউসে নিয়ে আসলেন। মি. আলী নিজেকে কে এস পির

সমর্থক বলে ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, তার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দাবি সঠিক নয়। সেই দিনই রাত সাড়ে এগারটায় দুটি গাড়ি গভর্নর হাউসের লনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে যিনি সর্বপ্রথম নামলেন, তিনি আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর একেকজন করে যারা নামল, আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত মি. আলীও রয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে নিয়ে সোজা গভর্নর সাহেবের স্টাডিরুমে চলে গেলেন। আমরা শুনলাম, আলী সাহেব বলছেন, তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থক, কে এস পির নয়।" (বঙ্গভবনের ১৫ গভর্নর, সৌখিন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৬)

কেন্দ্রীয় সরকার দুই মাস পর ১৯৫৮ সালের ২৫ আগস্ট আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা পুনবর্হাল করার আদেশ দেন। প্রাদেশিক পরিষদের পরিবেশন বসে ২০ সেপ্টেম্বর। সেদিনই পরিষদের কে এস পি সমর্থক স্পিকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অনাস্থা প্রস্তাব আনে। পরিষদে হৈ চৈ-হাঙ্গামা বেঁধে যায়। দুই দলের পরিষদ সদস্যগণ যুক্তির পরিবর্তে হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। এ অবস্থায় ২০ সেপ্টেম্বর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়। ২৫ সেপ্টেম্বর স্পিকার আবদুল হাকিমের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। দুই দলের বিবাদমান সদস্যগণ প্রথমে হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি শুরু করেন। এর পরে হাতের কাছে যিনি যা পেয়েছেন তাই দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে শুরু করেন। এই ঘটনার এক পর্যায়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী চেয়ারের আঘাতে মারাত্মকভাবে যখম হন। দু'দিন পর হাসপাতালে জনাব শাহেদ আলীর মৃত্যু হয়। বস্তুত ১৯৫৮ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় সৃষ্টি হয়। রাজনীতিকদের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃংখল আচরণ দেশকে সামরিক শাসনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই অবস্থা যখন চলছে, কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অবস্থাও তখন সংকটাপন্ন। রিপাবলিকান পার্টির সাথে মতপার্থক্যের কারণে সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর দলের ছয়জন সদস্যকে প্রত্যাহার করেন। মুসলিম লীগের সাথেও রিপাবলিকান পার্টির তীব্র বিরোধ চলছিল। ওয়ান ইউনিট প্রশ্নে ফিরোজ নুনের নিজ দলের অভ্যন্তরেও মতবিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক এই সংকটজনক পরিস্থিতির অজুহাতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ২৪ অক্টোবর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উভয় প্রদেশ থেকে

চারজন করে আটজন অরাজনৈতিক বেসামরিক ব্যক্তি এবং চারজন জেনারেল সমেত বারো সদস্যের এই মন্ত্রিসভায় জেনারেল আইয়ুবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগেই আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জার কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন। ২৮ অক্টোবর তিনজন জেনারেল পিস্তল উঁচিয়ে পাকিস্তান রাজনীতিতে 'মুর্শিদাবাদের দুষ্টগ্রহ' ইস্কান্দার মীর্জার কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফাপত্র আদায় করেন। এরপর তাঁকে প্রথমে কোয়েটা ও পরে লন্ডন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৫৮ সালের মার্শাল ল'-এর প্রধান কুকীর্তি ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাওয়া ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা। আইয়ুব খানের দ্বিতীয় কুকীর্তি মৌলিক গণতন্ত্র বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান সামরিক খোলস ভেদ করে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আইয়ুব খান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদিরের নেতৃত্বে একটি শাসনতন্ত্র কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন আইয়ুব খানের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে পূর্ণ গণতন্ত্রের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বা তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের সুপারিশ করেন। কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য ১৯৬১ সালের ২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গভর্নরদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান শাসনতন্ত্রের সুপারিশ-এর ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যে 'জনগণের ওপর আস্থা রাখা' এবং 'জনগণের রায়কে চূড়ান্ত বলে গণ্য করার' পক্ষে কথা বলার কারণে আইয়ুব খানের বিরাগভাজন হন। ১৯৬২ সালের ৩ জানুয়ারি করাচীতে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারেও পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর-এর মতামত নেওয়া হয়নি। কিন্তু এই গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার দায়-দায়িত্ব আজম খানের ওপরই চাপানো হয়। এ অবস্থায় আজম খান পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর পদে ইস্তফা দেন।

১৯৬২ সালের ১ মার্চ থেকে দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন প্রবর্তন করা হয়। এ সময় ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলার মৃত্যুর পর তার লাশ নিয়ে ঢাকাবাসীর অভূতপূর্ব শোক মিছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যম-এ পরিণত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে চল্লিশ হাজার করে আশি হাজার বি ডি মেম্বারের ভোটে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদসমূহ গঠিত হয়। ৮ জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। মার্শাল ল' অপসারিত হয়। আইয়ুব খান নতুন করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৪ জুন পূর্ব-পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নয়জন নেতা এক বিবৃতিতে আইয়ুব খানের নব প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র বাতিল করে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েমের দাবি জানান। সেই নয় নেতা ছিলেন নুরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, পীর

মোহসিন উদ্দীন (দুদু মিয়া), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং সৈয়দ আজিজুর হক (নান্না মিয়া)। এর কয়েক দিন পর পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় এই নয় নেতা শাসনতন্ত্র বাতিল করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন, রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবন, ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকার বহাল করা প্রভৃতি দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৪ জুলাই সকল রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আইয়ুব খানের ইঙ্গিতে মুসলিম লীগের একাংশ নিয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করে আইয়ুব খান তাতে যোগ দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেপ্টেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে 'নয় নেতা'র বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানান। তাঁর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এ সময় পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে ব্যাপক সফর করেন। ১৯৬২ সালের ৫ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী ও নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দলীয় জোট 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এন ডি এফ) গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী সারা দেশে গণতন্ত্রের সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে এ সময় যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন, তার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেলে তাঁর 'রহস্যজনক' মৃত্যু হয়। সোহরাওয়ার্দীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, স্বতন্ত্র দলীয় সাইনবোর্ডের বদলে এন ডি এফ-এর ব্যানারেই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন দিন পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

১৯৬২-৬৩ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা ছিল প্রতিবাদ মুখর। তারা হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। বহু লোক হতাহত হয়।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি আশি হাজার বি ডি মেম্বারের ভোটে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, এন ডি এফ, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল (কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি বা কপ) গঠন করা হয়। জাতীয় ঐক্যের প্রতীকরূপে কায়েদে আযমের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড় করানো হয়। বি ডি মেম্বারদের সীমিত ভোটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বিরোধী দলের জন্য অসাধ্য হলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিরোধী দলের কর্মীগণ এক প্রবল গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে লে. কর্নেল এ টি কিউ হকের সেনাপতিত্বে প্রথম বঙ্গশার্দুল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা দেশরক্ষার সংগ্রামে অশ্রুতপূর্ব ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

বিমান বাহিনীতেও বাঙালি স্কোয়াড্রন লিডার আলম ভারতীয় জঙ্গী বিমান ধ্বংসের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাহসের স্বাক্ষর রাখেন।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে এক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ছয় দফার প্রশ্নে শুধু সরকারি মহলে নয়, বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে সংগ্রামরত বিভিন্ন দল ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মাওলানা ভাসানী ছয় দফার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১৪ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পাল্টা আন্দোলনের ডাক দেন। বামপন্থি নেতা আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ ও মোজাফফর আহমদও ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ছয় দফা প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল আতাউর রহমান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় কয়েকটি দলের সমন্বয়ে 'পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট' (পি ডি এম) গঠিত হয়।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৭ সালের শেষের দিকে আইয়ুব খানের সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। এ মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত হয়। প্রথমে লে কর্নেল মোয়াজ্জম হোসেনকে এ মামলার প্রধান আসামী করা হয়। কয়েক দিন পর শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলায় জড়িয়ে তাঁকেই এক নম্বর আসামী করা হয়। এই মামলার প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং মামলার পূর্ণ বিবরণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে এই মামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পি ডি এম-এর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অতিক্রম করে এ সময় ১১ দফার দাবিতে পূর্ব-পাকিস্তানে অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থান সংগঠিহ হয়।

১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি পি ডি এম. এর সাথে ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থি ন্যাপ এবং পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর সমন্বয়ে ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটি বা 'ডাক' গঠিত হয়। ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের রক্তক্ষয়ী ব্যাপক আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন, শাসনতন্ত্র বাতিল, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলোপ এবং গভর্নর ও মন্ত্রীদের অপসারিত করেন। ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ওয়াদা করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক ঘোষণা করেন। যথা–

১. পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশ বা এক ইউনিট বিলোপ করে প্রদেশগুলো পুনর্বহাল,
২. সংখ্যা সাম্যনীতির বিলোপ করে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ভিত্তিতে সংখ্যানুপাতে নির্বাচন,
৩. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার প্রতিষ্ঠা,
৪. নব নির্বাচিত গণ পরিষদ কর্তৃক প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে একশ কুড়ি দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা এবং শাসনতন্ত্র রচনার পর গণ-পরিষদকে জাতীয় পরিষদে রূপান্তর,
৫. ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রম চালু,
৬. শাসনতন্ত্র রচনার সময় পর্যন্ত সামরিক আইন বহাল এবং
৭. ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন।

এর ক'দিন পর ইয়াহিয়া খান 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ প্রকাশ্য রাজনীতিতে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। পি, ডি এম-এর আন্দোলন, ডাক-এর আন্দোলন, এগার দফার আন্দোলন– সকল আন্দোলনের ফল গিয়ে জমা হলো আওয়ামী লীগের ঘরে। আওয়ামী লীগ সকল আন্দোলনের ফসল আত্মসাত করলো এবং অতীতের সংগ্রামসমূহের সহযোদ্ধাদের পথেও পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। ১৮ জানুয়ারি জামায়াত ও ২ ফেব্রুয়ারি পি ডি পি আহূত জনসভায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা চালিয়ে বানচাল করে দিল। নির্বাচনের পুরো সময়কাল ধরে সারাদেশে এই অবস্থা জারী রাখা হলো। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, সত্তরের নির্বাচনে দেশের আম-জনতাকে আওয়ামী লীগ একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমেই পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের দুটি আসন ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের সকল আসনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিই আওয়ামী লীগ দখল করে। অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিকাংশ আসনে ভুট্টোর পিপলস পার্টি জয়ী হয়।

শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে 'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তারপরই [illegible] রাজনৈতিক আকাশকে

অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলা-শাসকদের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে। ফলে তাদের সমর্থন ও মদদপুষ্ট ভুট্টো আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করলেন এবং ক্ষমতায় আধাআধি অংশীদারিত্ব দাবি করলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্য সকল রাজনৈতিক নেতা ভুট্টোর অবস্থানের নিন্দা করলেন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন মুলতবি করেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের বিক্ষোভের বারুদে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গোটা বেসামরিক প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। এরপর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে কয়েক দিন ধরে আলোচনায় মিলিত হন। ভুট্টোও ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। সারা দেশ স্তব্ধ হয়ে এই আলোচনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা থাকে। তারপর পঁচিশে মার্চের রাতে শুরু হয় সামরিক অভিযান।

পঁচিশে মার্চের সামরিক অভিযানের পর দেশের বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিক, ই. পি. আর, পুলিশ, আনসাররা বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাক বাহিনীর আকস্মিক হামলা, নির্বিচারে হত্যা ও বর্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতার দাবি রাতারাতি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু সম্পর্কে মঈদুল হাসান লিখেছেন :

> "২৭ মার্চ সন্ধ্যায় ৮ বি'র বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে ঘোষণা করলেও পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এই সব ঘোষণায় বিদ্যুতের মত লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, শেখ মুজিবের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতারের এই সব ঘোষণার পিছনে না ছিল রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিল কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি। .... মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই স্থানীয় ও খণ্ড-বিখণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হওয়ার বিষয়টি এদের জন্য মূলত ছিল অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার... বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্য পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা 'স্বাধীনতা' এই দু'টি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।"
> (মঈদুল হাসান : 'মূলধারা ৭১', পৃষ্ঠা ৫-৭)

মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র কালব্যাপী শেখ মুজিব ছিলেন এ যুদ্ধের এক বিরাট প্রেরণা। কিন্তু শেখ মুজিব মনেপ্রাণে স্বাধীনতা চেয়েছেন কি না, এ ব্যাপারে তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকদের অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ের আওয়ামী লীগ এম পি এম. এ. মোহাইমেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "শেখ সাহেবের এভাবে সেদিন রাত্রে (২৫ মার্চ) ধরা দেওয়াকে আমিও কোন দিন মনের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারিনি। অন্যেরা যে যাই বলুক, আমার নিজের ধারণা, আওয়ামী লীগের নেতারা তাজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে এভাবে দেশ স্বাধীন করবে এটা তিনি ভাবতে পারেনি। তাঁর ধারণা ছিল, পাকবাহিনী অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। বেশ কিছু নেতা ও উপ-নেতাকে হত্যা করবে। দশ-বিশ হাজার কর্মীকেও হত্যা করে সাময়িকভাবে দেশের আন্দোলন স্তব্ধ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। আগরতলা কেসের সময় তাঁকে যেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিল, সেভাবে দু'তিন বছর পরে তুমুল আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হবে।" (ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, পৃষ্ঠা ৬৫)

তিনি আরো লিখেছেন :

> "সশস্ত্র সংগ্রামে তার (শেখ মুজিব) তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বাসায় গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলে তাঁকে কখনো উৎসাহিত হতে দেখিনি। তাঁর গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭)

শেখ মুজিব স্বাধীনতা না চাইলেও ছাত্র লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ এক শ্রেণীর কম্যুনিস্ট ১৯৬২ সাল থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছিল। অলি আহাদ লিখেছেন :

> "১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদি অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।" (অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারার একদল লোক একটি বিশেষ চেতনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তাদের সম্পর্কে মেজর (অবঃ) এম এ জলিল লিখেছেন :

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নির্দিষ্ট রূপ যে ছিল না তা নয়, তবে সে চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল একটা মহলবিশেষের মধ্যে এবং তারা হচ্ছেন তৎকালীন ছাত্র সমাজের সচেতন মহলেরও একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ– বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সেই অংশটি যার নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরিফ প্রমুখ। এই অংশটির চিন্তা-চেতনায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানি চক্র থেকে মুক্ত করে এই অঞ্চলকে বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এর বাইরে যারা এই অঞ্চলকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে স্বাধীন, সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন কম্যুনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ ভাসানীর একটি অংশ, মরহুম সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেমসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।" (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃষ্ঠা ১৫)।

তিনি আরো লিখেছেন :

"এর বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল গতানুগতিক দেশপ্রেমিকদের দায়িত্ব স্বরূপ, ... নির্দিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্ত বাধ্য হয়েই– প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভ-লালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে 'এডভ্যানচারইজম'-এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিল।" (পূর্বোক্ত)

বস্তুত কৃষিজমির আইল বেয়ে উঠে আসা পূর্ববাংলার সাধারণ কৃষক সন্তানরাই ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল শক্তি, যাদের সামনে রাজনৈতিক কোন মতলব বা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না, ভারতের সাথে তাদের কোন যোগসাজসও ছিল না।

"অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বড় বড় বুলি কপচিয়েছিল, ইকবার হলকে কেন্দ্র করে যারা ৩ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল, যারা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃতই তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। ইকবাল হল-গ্রুপের মুজিব বাহিনী তৈরি হয়ে মাঠে নামার আগেই মুক্তিযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে যায়।" (আবুল আছাদ : কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১)

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আওয়ামী লীগের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে মস্কোপন্থি কম্যুনিস্ট পার্টি ও মো ন্যাপের কর্মীরা অক্টোবরের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়নি। পিকিংপন্থি ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টির কোন কোন নেতাকে ভারতে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়।

মাওলানা ভাসানীকে ভারতে প্রবেশের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (মাওলানার শাগরেদ) মইনুল হক চৌধুরীর সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধে ইন্দিরা গান্ধী মাওলানা ভাসানীর ব্যাপারে রাজি হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়টা মাওলানা ভাসানীকে ভারতে বন্দীদশায় কাটাতে হয়।

ন্যাপ-এর সেক্রেটারি জেনারেল মশিউর রহমান যাদু মিয়াকে ভারতে গিয়ে ওয়ারেন্ট-এর তাড়া খেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়।

কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন ও হায়দর আকবর খান রনো কলকাতার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে সাক্ষাত করে বামপন্থিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। তাজউদ্দিন তাতে অস্বীকৃতি জানান।

এ প্রসঙ্গে কাজী জাফর আহমদ তাঁর এক সাক্ষাতকারে বলেন :

> ”...... আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। দেশে ফিরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং-এর এক ডাক-বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। .... সাতদিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়।” (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০২)

অলি আহাদ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকেও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারত থেকে দেশে পালিয়ে আসতে হয়। (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, পৃষ্ঠা ৫০৭)

ইসলামপন্থি বলে পরিচিত যেসব রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়েছিল, তারা সেখানে টিকে থাকা দূরে থাক, তাদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়। এরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এম এ মোহাইমেন তাঁর 'ঢাকা আগরতালা মুজিব নগর' বইয়ে তুলে ধরেছেন।

এই অবস্থার মধ্যেই ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ও আওয়ামী লীগের দলীয়করণের আওতায় মুক্তিযুদ্ধ তার একটির পর একটি মঞ্জিল অতিক্রম করে।

নয় মাস স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে তিনটি চিহ্নিত পর্যায়ে। পঁচিশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তান বাহিনী দেশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আর

তৃতীয় পর্যায়ের শেষের দুই মাস জনসমর্থনহীন পাকবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় অংশ ভারতীয় আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তবে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের মাটিতে থেকে যুদ্ধ করেন। এই অংশটি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, বিদেশী আশ্রয় ও মদদপুষ্ট হয়ে নয়, যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক, মাতৃভূমিতে থেকেই লড়াই করে দেশকে মুক্ত করতে হবে। তাদের আশঙ্কা ছিল, ভারত বা অন্য কারো মদদ নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করা সহজ হবে ঠিক, তবে তাতে জনগণের প্রত্যাশিত মুক্তি আসবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আবুল মনসুর আহমদ 'একটা সামগ্রিক ও সর্বাত্মক জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করে লিখেছেন :

> "এমন অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত অন্যান্য দেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। চীনে চিয়াং কাইসেকের তথাকথিত সমর্থকদের প্রায় সবাই যেমন কার্যত মাও সেতুং-এর পক্ষে কাজ করিয়াছিলেন, চিয়াং বাহিনীকে দেওয়া মার্কিন অস্ত্র যেমন মাও বাহিনীর হাতে চলিয়া গিয়াছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাহায্যে দেওয়া অধিকাংশ অস্ত্র যেমন ভিয়েতকংদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানের বেলায়ও ঠিক তাই ঘটিয়াছে।" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)

পাক বাহিনীর নৃশংসতার মুখে জনগণের আত্মরক্ষামূলক ঐক্যবোধ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম, প্রাকৃতিক বাধাহীন ২৫৪২ মাইলের দীর্ঘ সীমান্তবর্তী বৃহৎ দেশ ভারতের নিজস্ব স্বার্থ ও প্রতিশোধস্পৃহা-তাড়িত সক্রিয় ভূমিকা, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যকার হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত একটি চূড়ান্ত পরিণতি দান করে।

যুদ্ধ শেষে পাক বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের এই ঘটনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানীকে দূরে রাখা হয়।

পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র ও রাজনীতিকদের ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'উপমহাদেশের মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সবচে শক্তিশালী দুর্গ' বাংলাদেশ এভাবেই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করে।

১৪.

বাংলাদেশ : আমাদের মিলিত সংগ্রাম

বাংলাদেশী শাসকদের সামনে পাকিস্তানের মতো জাতিগঠনের দুরতিক্রম্য বাধা নেই। ভারতের মতো বহুজাতিক দেশ না হওয়ায় এবং শ্রীলংকা বা মালয়েশিয়ার মতো ব্যুৎপত্তিগত সমস্যা না থাকায় এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুবিধা বেশি। কিন্তু বাংলাদেশের শাসকদের চারটি মৌলিক ভুলের কারণে স্বাধীনতার পরপরই এখানে কতকগুলো সমস্যা সৃষ্টি হয়।

প্রথমত ঃ জাতীয় ভাবমূর্তি বা National Image প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে জনগণের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অস্বীকারের চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ জাতীয় ঐক্যের অভিন্ন সূত্রগুলো খুঁজে বের করে সেই সূত্রে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভেদাত্মক নীতি অনুসরণ করা হয়।

তৃতীয়ত ঃ সুসংহত কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করা হয়নি।

চতুর্থত ঃ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করতে যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়।

জাতি-স্বাতন্ত্র্য প্রশ্নে সাময়িক বিভ্রান্তি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই বাংলার মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত নিজস্ব বোধ, বিশ্বাস এবং জাতিগত চেতনা ও প্রেরণার ধারাটি পাল্টে দেওয়া জন্য তাদের জীবন থেকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মুছে ফেলার বা জোর করে উৎখাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর প্রথম ঈদুল আযহার প্রাক্কালে কোরবানীর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর হঠাৎ রং পাল্টানো বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি প্রচার করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে কুরআনের বাণী প্রচার করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হলেও স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ বেতারে' 'কুরআন তিলাওয়াত', 'আসসালামু আলাইকুম', 'খোদা হাফেজ' প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোর

নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম এবং শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা হয়। সেখানে এ এলাকার জনগণের বোধ-বিশ্বাসের বিপরীত 'মঙ্গল প্রদীপ' প্রতিস্থাপন করা হয়। হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কাজী নজরুল কলেজ। সীমাহীন হীনমন্যতার কারণে এই পরিবর্তনের সময় অর্থের তোয়াক্কা না করে কবি নজরুলের নামের শেষাংশের 'ইসলাম' শব্দটিও বাদ দেওয়া হয়।

ইসলামের প্রতি অসহিষ্ণু একটি দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ করেই এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, 'দৈনিক পূর্বদেশে'র এক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে সে সময়ে জুমুআর খুতবা ও নামাযশেষে মুনাজাতে 'সাম্প্রদায়িক' বক্তব্য রাখার অভিযোগ করা হয়। আযানের সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখার ঐতিহ্য এখানে দীর্ঘ দিনের। অথচ স্বাধীনতার পরপর বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা চলাকালে মসজিদে আযান দিতে গিয়ে মুয়াজ্জিনগণ বাধাপ্রাপ্ত হন। বিভ্রান্তির সে চোরাবালিতে দাঁড়িয়েই দাউদ হায়দার রচনা করে মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে এক চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতা। যে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে এবং তাদের মা-বোন তাদের সাফল্যের জন্য রোযা রেখে নামায পড়ে দোয়া করেছে, এসব ঘটনা সেই জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলের নামে এভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি এবং তাদের সত্তার গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি আঘাত দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় জনমনে বিভ্রান্তি। দ্বাদশ শতকের সেন শাসিত বাংলাদেশে বৌদ্ধ-সভ্যতা নির্মূলের জন্য যে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য আগ্রাসন চালানো হয়েছিল, কুড়ি শতকের বাংলাদেশের এসব ঘটনা মুসলিম সভ্যতা নির্মূলের জন্য তেমনি আরেকটি অভিযানের আলামত মনে করে জনচিত্ত দারুণভাবে আলোড়িত হলো।

তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের 'এল্ডার স্টেটসম্যান' আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

> "(শাসকদের) মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হইয়াছিল যে, নিজেদের 'মুসলমান' ও নিজের রাষ্ট্রকে 'মুসলিম রাষ্ট্র' বলিলে সাধারণভাবে হিন্দুরা এবং বিশেষভাবে ভারত সরকার অসন্তুষ্ট হইবেন। এ ধারণা যে সত্য ছিল না, তা বুঝিতে যে রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তরুণ আওয়ামী নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেরই তা ছিল না। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র আখ্যা দিয়া যে সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রশংসা করিয়াছিলেন (১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে), অতি উৎসাহী ধর্মনিরপেক্ষ একজন অফিসার সে প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন, সে হীনমন্যতা হইতেই। আমাদের

রেডিও টেলিভিশন হইতে কোরআন তেলাওয়াত, আসসালামু আলাইকুম ও খোদা হাফেজ বিতাড়িত হইয়াছিল এবং ওসবের স্থান দখল করিয়াছিল সুপ্রভাত, শুভসন্ধ্যা ও শুভরাত্রি এই কারণেই। বাংলাদেশের জনসাধারণ আমাদের স্বাধীনতার এই রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল এমন পরিবেশেই।" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, এই প্রচারণাকে 'সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি' আখ্যা দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

"বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙ্গে নাই, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই 'পাকিস্তান' হইয়াছে। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্রের নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পুরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোন কারণ নাই।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১৭)

'সাংঘাতিক মারাত্মক' এই 'বিভ্রান্তি'র বিপদ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"দ্বিজাতিতত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে তবে '৪৭ সালের ভারত বাটোয়ারার আর কোন জাস্টিফিকেশন থাকিতেছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও জার্মানির মতই ভারতেরও পুনর্যোজনার চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলা সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১৫)

'হাজার বছর পরে বাংলাদেশ এই প্রথম স্বাধীন হয়েছে' এই ধরনের একটি ধারণাও সে সময় প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বাংলার জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসের মূল সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করা হয় জনগণের জাতি-স্বাতন্ত্র্যকে। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টার জবাবে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

"ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর আজকের বাংলাদেশ ছিল কলিকাতার হিন্টারল্যান্ড। কাঁচামাল সরবরাহের খামার বাড়ি। পঁচিশ বছরের পাকিস্তান আমলে এই খামারে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কিছু শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে।...... ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর বাঙালি মুসলমানদের অন্ধকার যুগ।.... কিন্তু ইংরাজ আমলের আগের চারশ' বছরের বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সেখানেও তাদের রূপ বাঙালি রূপ। সে রূপেই তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার স্বাধীনতার জন্য দিল্লীর মুসলিম সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, ভাষিক, কৃষ্টিক ও সামরিক, মনীষা ও বীরত্বের যুগ। সে যুগের সাধনা মুসলিম নেতৃত্বে হইলেও সেটা ছিল উদার অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু- বৌদ্ধরাও ছিল তাতে অংশীদার। এ যুগকে পরাধীন বাংলার

রূপ দিবার উদ্দেশ্যে 'হাজার বছর পরে আজ স্বাধীন হইয়াছে' বলিয়া যতই গান গাওয়া, শ্লোগান দেওয়া হউক, তাতে বাংলাদেশের জনগণকে ভুলান যাইবে না। আর্য জাতির ভারত দখলকে বিদেশী শাসন বলা চলিবে না; তাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, কায়েস্থকে বিদেশী বলা যাইবে না, শুধু শেখ-সৈয়দ-মোগল-পাঠানদেরই বিদেশী বলিতে হইবে, এমন প্রচারের দালালরা পাঞ্জাবী দালালদের চেয়ে বেশী সফল হইবে না।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১৯-৬২০)

ঐক্যের বদলে বিভেদের বীজ

বাংলাদেশ সৃষ্টির মাত্র আটত্রিশ দিন পর 'দালাল আইন' ও 'সরকারি আইন' নামে প্রেসিডেন্টের আট ও নয় নম্বর আদেশ জারি করা হয়। এটা সরকারের দ্বিতীয় ভুল। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নামক গ্রন্থে বলেন :

"এর ফলে নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থায় ফাটল ধরিল। অনাস্থা হইতে সন্দেহ, সন্দেহ হইতে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হইতে শত্রুতা পয়দা হইল। পল্লী গ্রামের স্বাভাবিক সামাজিক নেতৃত্বে যে আলেম সমাজ ও মাতব্বর শ্রেণী, তাদের প্রভাব তছনছ হইয়া গেল। ছাত্র-তরুণদের উপর শিক্ষক-অধ্যাপকদের আধিপত্যের অবসান ঘটিল। সে সামগ্রিক সন্দেহ, দলাদলি ও অবিশ্বাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রত্যর্পণ ব্যাহত হইল।....... সার্বজনীন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা পুলিশ বাহিনীর আওতার বাহিরে চলিয়া গেল।"

আর – নয় নম্বর আদেশের ফলে প্রশাসনিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল।

গোড়াতেই ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হলো সবখানে। জাতিকে 'দেশপ্রেমিক' ও 'দেশদ্রোহী', 'মুক্তিযোদ্ধা' ও 'অমুক্তিযোদ্ধা', 'ভারত ফেরত' ও 'পাকিস্তান প্রত্যাগত' নামে বিভক্ত করা হলো। রাজনৈতিক দলগুলোকে 'দেশপ্রেমিক' ও 'অদেশপ্রেমিক' এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'অমুক বাহিনী', 'তমুক বাহিনীর' নামে শতধা বিচ্ছিন্ন করা হলো। যুদ্ধ ফেরত প্রায় এক লাখ তরুণ-যুবকের. কেউ রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা পেল, আর কারো ভাগ্যে জুটলো জেল-জুলুম। মুক্তিযোদ্ধাদের জাতিগঠন ও উৎপাদনমুখী কাজে লাগতে ব্যর্থ হলেন শাসকগণ। গুম, খুম ও গুপ্তহত্যার শিকার হলো অনেকে। এ সময় বিবিসি'র জনৈক ভাষ্যকার ঘোষণা করেন :

"বাংলাদেশে প্রতিদিন যত গুপ্তহত্যা হয়, পৃথিবীর বৃহত্তম ভূমিকম্পেও তত লোক মারা যায়নি।"

জাতীয় মর্যাদা রক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করার ক্ষেত্রে শাসকগণ গোড়াতেই বড় রকম যে ব্যর্থতার পরিচয় দেন তার ফলে পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল ভারতীয় বাহিনীর কাছে, বাংলাদেশ বাহিনী কিংবা তথাকথিত 'যৌথ কমান্ডে'র কাছে নয়। আত্মসমর্পণের দলিলে তাই স্বাক্ষর পড়েছিল জগজিৎ সিং অরোরা ও নিয়াজির। ভারতীয় বাহিনী ঢাকা শহর এবং সারা বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানিদের পরিবর্তে নিজের কর্তৃত্ব ভালোভাবে স্থাপন করার পর ভারতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্র কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। (বদরুদ্দীন উমর : গণকণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

একেবারে শুরু থেকেই এ অভিযোগ উঠতে থাকে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর নিকট বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং আটটি গোপন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫ বছর মেয়াদি সামরিক চুক্তি ও সীমান্ত বাণিজ্যের মতো জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রত্যক্ষভাবে এবং ভারতের মাধ্যমে আমাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করছে। জনগণের মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শাসকগণ 'মিত্র রাষ্ট্র' ভারত ও রাশিয়ার সমালোচনা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

বিরোধী রাজনৈতিক নেতা অলি আহাদ এ সময় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে শাসকদের ব্যর্থতার সমালোচনা করে বলেন :

> "স্বাধীনতার অর্থ যদি সার্বভৌমত্ব হয় তবে তা মোটেই অর্জিত হয়নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিদেশ যেতে হলে যাত্রাপথে বা ফেরার পথে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই দিল্লীতে হাজিরা দিতে হয়। বিদেশের সাথে আমাদের আলোচনা কার্যকর হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে দিল্লী সরকারের সম্মতির উপর। সুতরাং আমরা দিল্লীর দাসে পরিণত হয়েছি। "The spirit of the great revolution has been betrayed by the Sheikh Government." (অলি আহাদ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২)

ভারতের পশ্চিম বঙ্গ সিপিএম-এর নেতা মি. সুন্দরায়া ৭২ সালের জুলাই মাসে মাদুরাই-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন :

> "ভারত সরকার তার বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।"

একই সাংবাদিক সম্মেলনে মি. প্রমোদ দাসগুপ্ত ভারতীয় হস্তক্ষেপের দুটি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন :

"ভারত সরকার কয়েকজন ভারতীয় অফিসারকে বাংলাদেশে মোতায়েন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ছদ্মবেশে কিছু ভারতীয় সৈনিককে ভারত সরকার এখনো বাংলাদেশে রেখে দিয়েছে।"

এভাবে শাসকদের ব্যর্থতার কারণে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কেই জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়।

জনতার মিলিত সংগ্রাম : মাওলানা ভাসানীর নাম

স্বাধীনতার পর সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের কারণগুলো দূর করা, জাতিসত্তার সুরক্ষা এবং জনগণের আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এ সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে নেতৃত্ব দেন আবুল মনসুর আহমদ এবং রাজনৈতিক ফ্রন্টে জনগণের সাহসী সংগ্রামে কান্ডারির ভূমিকা পালন করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি ভারত থেকে দেশে ফিরে মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশের বুকে রুশ-ভারত আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তার, সীমান্ত পথে দেশের মূল্যবান সম্পদ অবাধে পাচার ও নীতিবোধ বিবর্জিত দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষী মহলের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ২ এপ্রিল পল্টনের জনসভায় তিনি বলেন :

"বাঙালিরা ভারত, চীন, ব্রিটেন কিংবা আমেরিকা– কারো গোলামিই স্বীকার করবে না। প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করবো ইনশাআল্লাহ।"

স্বাধীনতার পর এই প্রথম কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা অনুষ্ঠিত হলো এবং মাওলানা নিজেই তাঁর ভাষণে 'নারায়ে তাকবীর– আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

২১ এপ্রিল দিনাজপুরের বড় ময়দানের জনসভায় তিনি সীমান্তের দশ মাইলের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তিনি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের সৈয়দপুরে বারো হাজার বিহারী কেন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলো, সরকারের কাছে তার কৈফিয়ত দাবি করেন।

২৪ মে যশোরের ঈদগাহ ময়দানের জনসভায় তিনি দশ দিনের মধ্যে হিন্দুস্তানের সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করেন এবং দেশের মাদরাসাগুলোর তালা অবিলম্বে খুলে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। বিভিন্ন জনসভায় এ সময় তিনি প্রশ্ন করেন :

"স্কুল খুলেছে, কলেজ খুলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, হাজার হাজার মাদরাসায় আজো তালা কেন? লক্ষ লক্ষ মাদরাসা ছাত্রের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কেন? স্বাধীনতার পর সমাজে আজান দেওয়া, ইমামতি, জুমা, ঈদ, খুতবা, জানাযা পড়ার প্রয়োজনও কি শেষ হয়ে গেছে?"

দেশে ফেরা মাত্র এক মাস পর মাওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জনগণের মুক্তির আকুতি ব্যক্ত করার মুখপত্ররূপে স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটি এ যুগসন্ধিক্ষণে সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। এ পত্রিকায় ভারতের সাথে বাংলাদেশের গোপন চুক্তিগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের 'বেসরকারি প্রধানমন্ত্রী' ডি পি ধরের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিয়মিত ও অব্যাহত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্যসমূহ প্রকাশ করে 'হক কথা' দেশবাসীকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সজাগ ও সচেতন করে তোলে।

দুঃশাসনের প্রতিবাদে এবং ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আপতিত বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে হুশিয়ার করার জন্য মাওলানা ভাসানী ১৯৭৩ সালে আমরণ অনশন শুরু করেন। এ উপলক্ষে তিনি ১৪ মে সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাতকারে বলেন :

> "যুবক হইয়া বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে জনসভা করিয়া সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তাই আমি অনশন ধর্মঘট করিয়া দেশের মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইতেছি।"

অনশনের পর এক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী ইসলামী শাসন কায়েমের আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> "সেদিন বেশি দূরে নহে, শুধু বাংলাদেশ নয়, দুনিয়ার বহু দেশে সংগ্রামী ইসলামী জোয়ানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ কায়েম হইবে।"

ভারতীয় পণ্য বর্জন, ভারতের সাথে সকল গোপন চুক্তি বাতিল প্রভৃতি দাবিতে মাওলানার ডাকে ২৯ আগস্ট সারা দেশে পুর্ণ হরতাল পালিত হয়। ৯ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী আহূত পল্টন ময়দানের জনসভায় তার স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রচারপত্রে "জনসাধারণকে সশস্ত্র সাড়াশী আক্রমণ চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করার" আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, "১৬ ডিসেম্বর পূর্ববাংলার জনগণের সবচে গ্লানিকর দিবস।" প্রচারপত্রটিতে আরো বলা হয় :

> "পূর্ববাংলার মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণের ওপর ধর্মীয় নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদের তাহজীব-তমদ্দুনকে ধ্বংস করে স্পেনের মতো তাদের নাম নিশানা মুছে ফেলবার চক্রান্ত চলছে।"

মাওলানা ভাসানী একাত্তর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রক্তমূল্যে কেনা স্বাধীনতা হেফাযত ও জনগণের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় সরকার ও তার এদেশীয়

কোলাবোরেটরদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, সে কারণে এই নবতিপর বৃদ্ধ আজীবন সংগ্রামী নেতাকে ভারতীয় মস্কোপন্থি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা রাজেশ্বর রাও ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়ে "বাংলাদেশের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী", 'স্বাধীনতাবিরোধী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করেন। মোজফফর ন্যাপ, মনিসিংহের কম্যুনিস্ট পার্টি ও এক শ্রেণীর আওয়ামী লীগ নেতা এরপর সেই সুরে সুর মিলিয়ে মাওলানাকে 'পাকিস্তানের দালাল', 'বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত', 'দেশদ্রোহী' 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি গালমন্দ করতে শুরু করেন। অন্যদিকে কলকাতার 'আনন্দ বাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় মাওলানাকে 'শয়তান,' 'বেঈমান,' 'ধূর্ত', 'ধুরন্ধর,' 'পাগল,' নিমকহারাম' ইত্যাদি অশালীন ভাষায় গালাগাল করে ১৯৭৩ সালে অন্তত আটটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

'প্রফেট অব ভায়োল্যান্স' নামে খ্যাত মাওলানা ভাসানী এসব নিন্দাবাদের প্রতিক্রিয়া খুবই ধীরস্থিরভাবে প্রকাশ করে বলেন, 'যে যাই বলুক, আমিই মুজিবের প্রকৃত ভালাই চাই'।

মাওলানা ভাসানীর রুশ-ভারত আধিপত্যবাদ বিরোধী ভূমিকার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, মো-ন্যাপ ও সিপিবির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে অনুষ্ঠিত জনসভায় মনিসিংহ মাওলানা ভাসানীকে টুকরো-টুকরো করে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করার হুমকি দেন। মাওলানা ভাসানী তার জবাবে বলেন :

> "শ্রী মনিসিংহ দেশে বড় একটা গোলযোগ বাধাইয়া উহার উসিলায় এখানে রুশ-হিন্দের প্রভাব আরও প্রত্যক্ষ ও মজবুত করিতে চাহিতেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোন প্রকার ষড়যন্ত্রই কায়েম হইতে দিব না।"

১৯৭৪ সালেও মাওলানা ভাসানী সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, শোষণ-লুটপাট এবং রুশ-ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতির প্রধান কান্ডারির ভূমিকায় পাহাড়ের মতো দৃঢ় কদমে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিলেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি জিহাদের ঘোষণা প্রচার করে বলেন :

> "আমরা হিন্দুস্তান, হিন্দু মহাসভা এবং বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলমানের অপরাপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব, যাহারা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করিয়া দিতে চায়। আমরা মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করিব, কারণ তাহারা আমাদের সকল ধান, চাউল, পাট, মাছ ও সোনা ইত্যাদি পাচার করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা হত্যা ও লুটপাটকারী সকল বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব।"

অপর এক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী এ সময় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন :

> "আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোন প্রকার ষড়যন্ত্র কায়েম হইতে দিব না। এই সংকল্প আমার একার নহে। বিগত দুই বৎসরে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশের কোটি কোটি স্বাধীনচেতা নাগরিক জান-মাল সব কিছু হারাইতে প্রস্তুত, কিন্তু রাশিয়া-ভারতের গোলামী মানিয়া লইবে না।"

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সে সময় সমগ্র জাতি নিজেদের জাতিসত্তা সুরক্ষার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

জাতিসত্তা ও সংবিধান

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান বলবত হয়। তাতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অনুকরণে চারটি মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র নামক উপাদান দুটি ছিল এদেশের জনগণের সুদীর্ঘ সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শাসক দল আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনী ইশতেহার কর্মসূচিতে এ দু'টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিংবা সত্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের ১৯৭১ সালের ঘোষণাপত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের প্রতি কোন অঙ্গীকার ছিল না।

১৯৭২-এর সংবিধান আওয়ামী লীগ শাসনামলে মাত্র দুই বছর এক মাস দশ দিনের মধ্যে চারবার সংশোধন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই মাত্র সাত মাসের মধ্যে আনীত প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একশ পঁচানব্বই জন পাকিস্তানী সৈন্যের সর্বশেষ দলটিকেও দিল্লীর ডিক্টেশনে হস্তান্তর করা হয়। একই বছর ২২ সেপ্টেম্বর আনীত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আইনে ছয় মাস পর্যন্ত আটক রাখার কালাকানুন বলবত করা হয়। এছাড়া এর দ্বারা প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করে সংবিধানে বর্ণিত 'চলাফেরার স্বাধীনতা', 'সমাবেশের স্বাধীনতা', 'সংগঠনের স্বাধীনতা', 'বাকস্বাধীনতা' এবং সম্পত্তির অধিকার সম্বলিত মৌলিক মানবাধিকারের বিধানসমূহ স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। ভারতের কাছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড বেরুবাড়ী হস্তান্তরের চুক্তি কার্যকর করা ছিল এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মাত্র কয়েক মিনিটের সংসদীয় ক্যু-এর মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানের খোল-নলচে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলা হয়। জনগণের প্রতিনিধিত্ব, মৌলিক অধিকার, মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা, আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা– সব কিছুর ব্যাপারে সকল রীতি-রেওয়াজ, পদ্ধতি ও আইনের

আমূল পরিবর্তন করে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদলে 'এক দলের' নামে এই দেশের সবকিছু 'এক ব্যক্তির' ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দেওয়া হয়। আর এই পরিবর্তনের নাম দেওয়া হয় 'দ্বিতীয় বিপ্লব'।

যে মানসিকতা থেকে এই অভূতপূর্ব 'বিপ্লব' সাধিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'-এ এই তথাকথিত বিপ্লবের অনেক দিন আগেই লিখেছেন :

> "সত্যই মুজিবর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে, তিনি যেটাকে পার্টিপ্রীতি মনে করিতেন, সেটা ছিল আসলে তার ইগইযম– আত্মপ্রীতি। 'স্বরাজ দেশে'র জন্য খুবই দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমার হাত দিয়া না আসে তবে না আসাই ভাল। ...... আমার বিবেচনায় মুজিবর রহমানের মধ্যে আত্মপ্রীতি ছিল খুবই প্রবল। এটাকে তিনি পার্টিপ্রীতি বলিয়া চালাইতেন।"

শেখ মুজিবের এই 'ইগইযম'কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য মস্কোপন্থি কম্যুনিস্টরাই চতুর্থ সংশোধনীর নেপথ্য-নায়কের ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ তখন একটা 'তলাহীন ঝুড়ি'। দেশের অর্থভাণ্ডার শূন্য। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। বিশ্বখ্যাত পত্রিকাগুলো কালোবাজারীকে 'বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি'রূপে চিহ্নিত করছে। মহানগরী পরিণত হয়েছে বেওয়ারিশ লাশের নগরীতে। মানুষ কলাপাতায় লজ্জা ঢাকছে। ডাস্টবিনে চলছে মানুষে-কুকুরে কাড়াকাড়ি। গুম, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, সংবাদপত্রের খবর হওয়ার যোগ্যতা হারাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের বিশীর্ণ মিছিলের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সর্বস্তরের মানুষ চাইছে পরিবর্তন। ভুখা জনতার অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্ধপানে শীর্ণ দু'খানি হাত তুলে ফরিয়াদ করছে, "খোদা গজব থেকে বাঁচাও"। এমনি পরিস্থিতিতে রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনীর ধারালো দাঁত-নখও ভোঁতা প্রমাণিত হচ্ছিল। এই পটভূমিতে ক্ষমতার মসনদকে আসন্ন গণরোষের হাত থেকে হেফাযত করার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'রূপেই আনা হয় 'চতুর্থ সংশোধনী'। দুনিয়ার রাজনীতির ইতিহাসে এ ধরনের সংশোধনীর নযীর নেই।

শেখ মুজিব তাঁর ক্ষমতার বিস্তার ও স্থিতির জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই ইগয়িস্ট মানসিকতাকে সহজেই কাজে লাগাতে পেরেছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এদেশী এজেন্টরা। মধ্যপন্থি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী কম্যুনিজমের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি। এই নীতির ওপর ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ একবার ভাগ হয়েছিল। কিন্তু ৭৩ সালে দেশে বিরাজিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মোজাফফর ন্যাপ ও মনিসিংহ'র কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে

ঘাপটি মেরে থাকা তাদের এজেন্টদের সহযোগিতায় 'গণঐক্য জোট' নামে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠনে সক্ষম হয়। তাদেরই প্ররোচনায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করে, যেখান থেকে ফিরে আসার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়।

চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশের মস্কোপন্থি কম্যুনিস্টদের ষড়যন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন। এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন নয়াদিল্লী জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর এবং 'এশিয়ায় সোভিয়েট নীতি' বিষয়ক গবেষক মি. ভবানী সেনগুপ্ত। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মি. মনিসিংহ-এর সাথে একঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। প্রফেসর গুপ্ত ১৯৭৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে সেই সাক্ষাতকারের বিবরণ দেন। মি. মনিসিংহ এর বরাত দিয়ে মি. সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের জন্য সোভিয়েট অনুমোদিত একটি রাজনৈতিক নীলনকশা প্রকাশ করেন। মি. মনিসিংহ তাঁর সাক্ষাতকারে উক্ত রাজনৈতিক নীল-নকশা সম্পর্কে বলেন : "এই ব্যবস্থায় দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট 'প্রগতিশীল, দক্ষ ও সৎ' লোকদের সমন্বয়ে একটি কেবিনেট গঠন করবেন। একটি জাতীয় সংসদ থাকবে, যার ক্ষমতা থাকবে সীমিত। সংসদের কাছে কেবিনেট দায়ী থাকবে না।"

শেখ মুজিব মি. মনিসিংহদের রাজনৈতিক নীলনকশা গ্রহণ করবেন কেন, আর তিনি তা গ্রহণ না করলে কম্যুনিস্টরা কি করবে, প্রফেসর সেনগুপ্ত মনিসিংহকে এই প্রশ্ন করলে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট নেতা জবাবে বলেন :

> "We strongly believe that the force of circumstances will compel the Sheikh to adopt our model .... We have told him that if he adopted our model, we would do our best to make it a success. If he rejects it, we will fight for it, whatever the consequences.".
>
> 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পরিস্থিতি শেখকে আমাদের পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করবে। ...... আমরা তাকে বলেছি, আমাদের পদ্ধতি গ্রহণ করলে তা সফল করতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। শেখ এই পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করলে পরিণতি যা-ই-হোক, আমরা এর জন্য সংগ্রাম করবো।"

মনিসিংহ প্রফেসর ভবানী সেনগুপ্তকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাতকারে খুব জোরের সাথে বলেন যে, বাংলাদেশ 'সঠিক রাজনৈতিক লাইন' অনুসরণ করলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো প্রয়োজনীয় সব ধরনের মদদ যোগাবে। এই সাক্ষাতকার প্রকাশের মাত্র এক মাসের মধ্যেই শেখ মুজিব চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সংবিধান সংশোধন করে দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং সামগ্রিক ব্যবস্থায় যে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক পরিবর্তন আনা হয়, তা ছিল এ দেশের সংগ্রামশীল জাতির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতীতে শত শত বছর ধরে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বশাসন, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং সকল প্রকার আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিরাপোষ স্বাধীনচেতা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অধিকারী সাহসী জাতিরূপে এ ভূখণ্ডের জনগণের যে মেজাজ ও মানস-কাঠামো গড়ে উঠেছে, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন তাদের সেই মনস্তত্ত্বকে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে জনমনে যে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছিল, চতুর্থ সংশোধনী ছিল তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের ঘটনা সে পটভূমিতেই সংঘটিত হয়।

১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট মুজিব সরকারের পতনের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোয় এ সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী অনেক প্রতিবেদন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলো ঢাকার কাগজগুলোয়, বিশেষত দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিতভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়। এসব বিদেশী পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, জাতির আত্মপরিচয় বা জাতিসত্তা সংক্রান্ত বোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মূল্যায়নের ব্যর্থতা এবং বিশেষভাবে ইসলামের অমর্যাদা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করা শেখ মুজিবের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্টের পরিবর্তনের পর ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত একটি প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা চলে। কিন্তু সিপাহী জনতার নযীরবিহীন ঐক্যবদ্ধ শক্তি সাতই নভেম্বরের প্রত্যূষে তা নস্যাত করে দেয়। এরপর থেকে দেশে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়, তার ফলে জাতীয় সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনিরূপে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়। সমাজতন্ত্র শব্দটি সংবিধানে নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতিকে সংবিধানে স্বীকার করে নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সন্নিবেশিত করা হয়। এভাবে জাতি তাদের সত্তা ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তির কুজ্ঝটিকা কাটিয়ে একটা দিক নির্দেশনার দিকে যাত্রা শুরু করে। এরপর সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

দেশ ছোট কিন্তু জাতি অনেক বড়

ইতিহাসের চাকা জোর করে পেছনে ঘুরানো যায় না। এ সত্য আমাদের অতীত ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। রাজা গণেশের চক্রান্ত নস্যাত করতে পঞ্চদশ

শতকে নূর কুতুব-এর নেতৃত্বে এ দেশের জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তার আগে এবং পরে এমনি আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। এভাবেই আমাদের জাতিসত্তা নস্যাতের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়ে সাহসী সংগ্রামী এই জাতি আজ ইতিহাসের বর্তমান মঞ্জিলে উপনীত হয়েছে।

জাতিসত্তা নির্মাণে ভুল ও বিভ্রান্তি একটি জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। পাল আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের শাসকের ভুলের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে স্পষ্ট। আমাদের যে কোন ভুলের সুযোগ নেওয়ার জন্য হাঙ্গরের মতো মুখ ব্যাদান করে আছে এমন এক শক্তি, যাদের সাথে হাজার বছর লড়াই করে আমাদের সাহসী জাতি এগিয়ে এসেছে এত দূর। স্বাধীন-সার্বভৌম ও সংহত অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশকে তার রাষ্ট্রগঠন কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতিগঠনকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। কাটিয়ে উঠতে হবে আত্মপরিচয়ের সকল বিভ্রান্তি। আর এ জন্য :

ক. বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জাতীয় ইমেজ ও আইডেন্টিটি নির্মাণ করতে হবে।

খ. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ও সকল ক্ষেত্রে ঐক্য জোরদার করতে হবে। যে কোন ঐক্য-বিনাশী তৎপরতা দেশের শত্রুদের হাতেই অস্ত্র তুলে দেবে। বিভিন্ন চেতনার ধুয়া তুলে জাতিকে ঘুমে অচেতন রেখে যারা জাতির সত্তা ও অস্তিত্বের সিন্দুক চুরি করতে চায়– তাদের সম্পর্কে সজাগ-সচেতন, জাগ্রত থাকতে হবে সকলকে।

গ. জনগণের আস্থা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি স্থিতিশীল ও দৃঢ়বদ্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সুসংবদ্ধভাবে চালু রাখতে হবে এবং যে কোন হুমকির হাত থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সুস্থ ধারার সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক মহলকে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘ. লর্ড এ্যাক্টনের ভাষায় : "বিশাল শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী দেশের দাসত্ব করার চাইতে দরিদ্র ও দুর্বল স্বাধীন দেশের মর্যাদাবান নাগরিকের জীবনই কাম্য"।

জনগণ যুগে যুগে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। "দেশ হিসেবে ছোট হলেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড়"– এ উপলব্ধি এ জাতির বিরাট শক্তি ও সম্পদ। এতেই প্রোথিত এ জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের বীজ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ডক্টর এম. এ. রহীম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা. ১৯৮৫। এ হিস্ট্রি অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ঢা. বি, ১৯৮১

২. আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

৩. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮০

৪. ডক্টর এ কে এম আইয়ুব আলী : হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩

৫. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮০

৬. আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২

৭. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৭৫

: গ্রাম বাংলার ইতিকথা ('এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থের অসীম চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ), সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৯৮৪

৮. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮

৯. মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলমান সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

১০. ড. হাসান জামান : শতাব্দী পরিক্রমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪

১১ রফিউদ্দিন আহমদ : দি বেঙ্গল মুসলিম্স, এ কোয়েস্ট ফর আইডেনটিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৮১

১২. রওনক জাহান : পাকিস্তান ফেল্যুর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৭৭

১৩. আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪।

: পাক বাংলার কালচার, আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা, ১৯৬৬;

: শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, খোজরোজ, ঢাকা ১৯৭৩

১৪. ড. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালির ইতিহাস (আদিপর্ব), (সুভাষ মুখ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত), মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৮৩

১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : বাংলা ও বাঙ্গালি : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২

১৬. মন্মথমোহন বসু : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কবি. ১৯৫৯

১৭. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮৭

১৮. বিশ্বেশ্বর চৌধুরী : টেকনাফ থেকে খাইবার, ঢাকা

১৯. আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭;

: সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিম্স অব বেঙ্গল, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম, ১৯৮৫

২০. গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪

২১. মাওলানা আকরম খাঁ : মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৯৬৫

২২. আজিজুর রহমান মল্লিক : ব্রিটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৭

২৩. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

২৪. অধ্যাপক আবদুল গফুর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

২৫. স্বপন বসু : বাংলার নব চেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮৫

: গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজ, ঐ, ১৯৮৭

২৬. রাধারমন রায় : কলকাতা বিচিত্রা, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৯১

২৭. বিনয় ঘোষ : টাউন কলকাতার কড়চা, বিহার সাহিত্য ভবন কলকাতা, ১৯৬১

: কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯১

২৮. এম এন রায় : ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ

৩০. এ কে রায় : এ শর্ট হিস্টরি অব ক্যালকাটা

৩১. আবদুল গফুর সিদ্দিকী : শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬২

৩২. রজনী পাম দত্ত : আজিকার ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৪৮

৩৩. সুরজিতদাস গুপ্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম

৩৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ : মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩

৩৫. বদর উদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৮১
: বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, চলন্তিকা, ১৯৯১
৩৬. আবুল কাশেম চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
৩৭. রমেশচন্দ্র দত্ত : দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া
৩৮. যদুনাথ সরকার : হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢা. বি, ঢাকা, ১৯৭৬
৩৯. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯
৪০. ডক্টর পুলিন দাস : বংগ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক
৪১. এম কে ইউ মোল্লা : দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, দি ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১
৪২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭০
৪৩. শেখ মোহাম্মদ ইকরাম : পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৪
৪৪. কামরুদ্দীন আহমদ : পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৭৬
: এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব. বেঙ্গল, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা ১৯৭০
৪৫. বিমলানন্দ শাসমল : স্বাধীনতার ফাঁকি, হিন্দুস্থান বুক সার্ভিস কলকাতা, ১৯৯১
: ভারত কী করে ভাগ হলো, ঐ
৪৬. বিহারী লাল সরকার : তিতুমীর (স. স্বপন বসু) পুস্তক বিপণী, কল, ১৯৮৭
৪৭. লতিফা আকন্দ : সোশ্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১

৪৮. ড. মোহাম্মদ মোহর আলী : হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, (৪ খণ্ড) ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, ১৯৮৫

৪৯. এম এ জিন্নাহ : ইন্ডিয়া'স প্রব্লেম অব হার ফিউচার কনস্টিটিউশন, বোম্বে, ১৯৪০

৫০. সুমিত সরকার : দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৮), পিপলস পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ১৯৭৩

৫১. ড. অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ–রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২

৫২. শরীফউদ্দীন পীরযাদা : ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান

৫৩. বি আর আম্বেদকর : পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৬

৫৪. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩

৫৫. মতিউর রহমান : ফ্রম কনসালটেশন টু কনফ্রন্টেশন

৫৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : নওয়াব সলীমুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৫৭. নিরোদচন্দ্র চৌধুরী : অটোবায়োগ্রাফী অব এন আনোন ইন্ডিয়ান

৫৮. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন : বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালি সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৫৯. নাজিরুল ইসলাম মোঃ সুফিয়ান : বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২

৬০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা ২ খণ্ড, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, '৬৩

৬১. ড. তারাচাঁদ : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

৬২. হেনরী বেভারিজ : দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ, ১৯৭০

৬৩. সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর খুলনার ইতিহাস

৬৪. নিখিলনাথ রায় : মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুথিপত্র, কলকাতা, ১৯৮৮

৬৫. কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ : জার্নাল, পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭০

৬৬. সিরাজ উদ্দীন হোসেন : ডেইস ডিসাইসিভ, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ৭০

৬৭. ফজলে হক খায়রাবাদী : আযাদী আন্দোলন : ১৮৫৭, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮

৬৮. মুনশী রহমান আলী তায়েশ : তাওয়ারিখে ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫

৬৯. ড. মুঈনউদ্দীন আহমদ খান : হিস্ট্রি অব দি ফরায়েজী মুভমেন্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪

: তিতুমীর এন্ড হিজ ফলোয়ারস, ঐ

৭০. ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী : আসপেক্টস অব দি হিস্ট্রি, কালচার এন্ড রিলিজিওনস অব পাকিস্তান, সিয়াটো, ব্যাংকক, ১৯৬৩

৭১. খন্দকার ফজলে রাব্বী : দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল (১ম প্রঃ ১৮৯৫) ২য় সংস্করণ, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭০

৭২. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হুদা : পলাশী-উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ঢাকা, ১৯৯১

৭৩. আখতার ফারূক : বাংগালির ইতিকথা, জুলকারনাইন প্রকাশনী, ঢাকা

৭৪. মওদুদ আহমদ : বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৭

৭৫. এম আর আখতার মুকুল : কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭